# রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তি লাইব্রেরী

কলিকাতা ঃঃ এলাহাবাদ



রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা

প্রথম প্রকাশ ঃ জন্মাষ্টমী ঃ শ্রাবণ ঃ ১৩৬২

প্রকাশক ঃ অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তি লাইব্রেরী

১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

৮১, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ-৩

মুদ্রাকর ঃ সন্তোষকুমার ধর

মুদ্রণ ঃ ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস

৯।৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট ঃ ব্রজ রায় চৌধুরী

ব্লক মুদ্রণ ঃ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এন্‌গ্রেভিং কোং

দু' টাকা চার আনা

অধ্যাপক ডাঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম-এ., ডি-ফিল্., 

সুহৃদ্বরেষু

রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের প্রতিপাদ্যটি অনুধাবন করিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহাতে একটি বিশিষ্ট জীবন-ভূমি আমাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে। এই জীবন একটি বৃহত্তর জীবন। জ্ঞানে, প্রেমে এবং কর্মে এই জীবনে একটি আনন্দময় মুক্তি রহিয়াছে। এই জীবনের রূপটি মানবিক হইলেও তাহার কিছুটা আছে সংসারে, কিছুটা আছে ধ্যানে, কিছুটা রূপলোকে, কিছুটা ভাব-জীবনে। সংসারে তাহার জন্য সাধনা করিতে হয়, গভীর দ্বন্দ্ব -বেদনার মধ্য দিয়া পথ চলিতে হয়। এই বৃহত্তর জীবন তাই সাধনার জীবন। এই সাধনা যখন স্বভাবে পরিণত হয় তখন এই বৃহত্তর জীবনই বাস্তব জীবনের মত সত্য ও সহজ জীবন হইয়া উঠে। তখন চাওয়া-পাওয়া, ভাল-মন্দের বিরোধকে স্বীকার করিয়াই আমরা তাহা হইতে উত্তীর্ণ হই। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠে সহজ-জীবনের সেই ধ্যান ও সাধনা প্রসঙ্গে আমাদের যে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, 'সোনারতরী' হইতে 'গীতালী' পর্যন্ত কাব্যপ্রবাহের তত্ত্ব ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাহারই আনন্দ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

"হরিধাম"
চুঁচুড়া
শ্রাবণ, ১৩৫৫

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

# রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা

## প্রথম অধ্যায়

### *সোনার তরী : জীবন-ধ্যান*

সোনার তরী কাব্যে কবি রবীন্দ্রনাথের মনোজীবনের অভিসার সুরু হইয়াছে, জীবনের দুইটি পর্যায়কে কবি এখানে সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছেন —একটি পর্যায় আপনাকে লইয়া, আর একটি পর্যায় বিশ্বকে লইয়া। জীবনের সুখ-দুঃখের একটি ব্যক্তিগত দিক রহিয়াছে। এই ব্যক্তির দিক হইতে জীবনকে আমরা একভাবে আস্বাদন করি। কিন্তু ব্যক্তির জীবনবোধে যদি বিশ্ব স্থান না পায় তাহা হইলে সেই নিতান্ত আপনার সুখদুঃখের মধ্যে ব্যক্তি পীড়িত ও জীর্ণ হইয়া বিকার লাভ করিতে থাকে। যখন কেবলমাত্র নিজেকে লইয়া থাকি তখন বিশ্ব যে আস্বাদনের বিষয় তাহা আমরা অনুভব না, বিশ্বকে লাভ করিবার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা জাগে না। আমাদের জীবন একদিকে অহংকে কেন্দ্র করিয়া সীমাবদ্ধ, অপরদিকে বিশ্বকে লক্ষ্য করিয়া অনন্তের দিকে পরিব্যাপ্ত। জীবন যেখানে অহংকেন্দ্রিক, সেখানে আমি হইলাম 'ছোট-আমি' তথা খাঁচার পাখী; জীবন যেখানে বিশ্বমুখী, সেখানে আমি হইলাম 'বড়ো-আমি' তথা বনের পাখী। এই অহং হইতে বিশ্বের দিকে ছোট-আমি হইতে বড়ো-আমির দিকে অভিসারই রবীন্দ্রদর্শন ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্মবাণী। সোনার তরী কাব্যে এই খাঁচার পাখী ও বনের পাখীর প্রথম পরিচয় পাই।

রবীন্দ্র দর্শনের বিচিত্র তত্ত্বগুলি 'সোনার তরী' কাব্যে হয়তো খুব স্পষ্ট করিয়া দেখা যাইবে না। জীবনের সত্য আস্বাদনের বিষয় হইয়া উঠে তত্ত্বরূপে

নহে, কতকগুলি অস্ফুট আনন্দানুভূতি এবং অনাস্বাদিতপূর্ব বেদনা বোধের মধ্য দিয়া চেতনায় যাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তত্ত্বরূপে তাহাই নির্দিষ্ট হয়। সোনার তরী কাব্যেও কতকগুলি আনন্দানুভূতি ও বেদনাবোধের মধ্য দিয়া যাহা উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহাকে আমরা তত্ত্বরূপে ততটা দেখি না, যতটা রসরূপে দেখিতে পাই। তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্র-মানসের পরিচয় গ্রহণ কবিতে যাইলে কবির কাব্যের প্রাণবস্তু তত্ত্বালোচনায় ঢাকা পড়িয়া যাইবে। এক্ষেত্রে তাই রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসায় তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ না করিয়া কাব্যের রসাস্বাদনে কবিমানস সম্বন্ধে যে ধ্যান ও ধারণা করিতে পারা যায় আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

আপনাকে কেন্দ্র করিয়া যে-জীবন, যাহাতে নিজের সুখ-দুঃখ নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা-কামনাই মুখ্য বিষয়, সেই জীবন খাঁচার পাখীর মতন আপনার অহং-এর বন্ধনে বদ্ধ। নিজের সুখ-দুঃখকে একান্ত করিয়া এই যে 'নিরালা সুখ কোণে' আপনাকে বাঁধিয়া রাখা, 'মানসী' কাব্যে ইহার পরিচয় পাই। ইহাতেও একপ্রকার জীবন রসাস্বাদন ঘটে কিন্তু ইহাতে সুখের বিকার আছে, দুঃখের হাহাকার আছে। 'ব্যর্থ যৌবনে'র বেদনায় সুখের সেই বিকারের ইঙ্গিত পাই। ঝুলন কবিতায় কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন,

শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান
আলসরসে
আবেশ বশে।
পরশ করিলে জাগেনা সে আর,
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার
নিশি দিবসে;
বেদনা বিহীন অসাড় বিরাগ
মরমে পশে
আবেশ বশে॥

আপনাকে লইয়া যে দুঃখ, সে দুঃখও হাহাকারে পর্যবসিত হয়ঃ—কনক দর্পণ হাতে লইয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ধরাতলে সর্বাপেক্ষা রূপসী কে?' মায়া মুকুরে মধুমাখা, হাসি-আঁকা একখানি মুখ ভাসিয়া উঠিল—সতীনের মেয়ে রাজকন্যা বিম্ববতী ধরাতলে সর্বাপেক্ষা রূপসী। অহংখর্বের এই দুঃখ দুর

করিতে রাণীর কত মতো হিংসার আয়োজন। কিন্তু অহংএর জয় হইল না; সর্বাঙ্গে বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা এবং অহংকে সাজাইবার জন্য মণিমাণিক্যের ব্যর্থ আয়োজন লইয়া রাণী মরিয়া গেল।

খাঁচার পাখী আপনার সুখ-দুঃখের জীবন লইয়া খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ। খাঁচার বেড়াগুলি কিসের? ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখের ঐকান্তিকতাই ব্যক্তির চারিধারে একটি খাঁচা তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে। সেখানে বিকার ও হাহাকারের মধ্যে যাইয়াই খাঁচার পাখীর ডানা দুইটি অবশ হইয়া গিয়াছে। মুক্ত জীবনে উড়িবার শক্তি তাহার নাই, মুক্তির আনন্দ হইতে সে বঞ্চিত।

যখন আপনাকে লইয়া থাকি, আপনার সুখ-দুঃখকেই একান্ত বলিয়া জানি, তখন যে-জীবনকে আস্বাদন করি, সে জীবনটি হইল খাঁচার জীবন। তাহাকে বন্দীদশা বলিয়া বুঝিতে পারি না, কারণ তাহার মধ্যে রস পাই। বরং ইহাতেই এমন অভ্যস্ত থাকি যে, 'উড়া' বলিয়া জীবনে যে আর একটি পর্যায় আছে, ডানা মেলিয়া দিবার যে আর একটি উদার আনন্দ আছে, তাহা ভুলিয়া যাই। স্বভাবেরই বিকার ঘটিয়া যায়।

এই খাঁচার জীবনটি যে আমার বড়ই প্রিয়। জীবনের কত উদগ্র ক্ষুধায়, চাওয়া-পাওয়ার কত হাসি-অশ্রুর মুখর দ্বন্দ্বে আপনার চারিধারে এই যে একটি প্রেয়-জীবনের আবেষ্টনী গড়িয়া তুলিয়াছি ইহার বাহিরে আর কাহাকেও যে বুঝি না। আমারই সৃষ্ট বন্ধন-দণ্ডগুলি আমাকে যে এক মধুর মৃত্যুর মধ্যে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এই খাঁচার জীবনের যে কিছুই ত্যাগ করিতে পারি না, কোন একটি বাধাকেও সরাইয়া দিতে পারি না; বাধা জানিয়াও তাহাকে আঁকড়িয়া ধরি। তাহার কাছে আসিয়া ডানা ঠেকিয়া যায়, কিন্তু সেই বাধাকেই আদর করিয়া বরণ করিয়া লই; বলি,—এইটি আমার সোনার খাঁচা।

প্রেয়ের জীবন আমাদের কাছে বন্ধন হইয়া উঠে, আমাদের চিত্তের চারিপাশে তাহা একটি খাঁচা রচনা করিয়া দেয়। এই সোনার খাঁচা হইতে বাহির হইবার যে আকুতি ও প্রস্তুতি, পথচলার যে একটি সুকুমার হৃদয়াবেগ ও নবীন উৎসাহ, এবং বাহিরের জগৎকে আস্বাদন করার যে একটি অননুভূতপূর্ব রসিকতা ও অভিনব মানসোল্লাস, সোনার তরী কাব্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই।

যে অভিনব জীবন-ধ্যানে কবি সোনার খাঁচার বাহিরে আসিলেন, যে বৃহত্তর জীবনবোধে কবির মানসাভিসার সুরু হইল, সেই বিকশিত চেতনা

বা বৃহত্তর জীবনবোধকেই কবি 'সোনার তরী' বলিয়াছেন। 'সোনার খাঁচা' যেমন রচিত হইয়াছে প্রেয়ের বাসনায়, 'সোনার তরী' তেমনি রচিত হইয়াছে শ্রেয়ের আকাঙ্ক্ষায়। খাঁচাটি কবির কাছে যেমন প্রিয়, এই তরীটিও কবির কাছে তেমনি প্রিয়। খাঁচাটি যেমন 'সোনার খাঁচা', তরীটি তেমনি 'সোনার' তরী।

কবির সোনার খাঁচার মধ্যে এই একটি সোনার তরী দুলিয়া উঠিয়াছে। খাঁচার পাখীটি সেই সোনার তরীতে করিয়া খাঁচার বাহিরে আসিতে চাহিয়াছে। কবি আপনার ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখে মগ্ন ছিলেন, এখন কবি বিশ্বজীবনের আনন্দ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। কবি-চিত্তের এই উদ্বোধনই সোনার তরী কাব্যের মর্মবাণী।

সোনার তরীতে করিয়া কবির যাত্রা সুরু হইয়াছে; কবি শ্রেয়ের চেতনায় তথা বৃহত্তের চেতনায় জাগ্রত হইয়াছেন। এই বৃহৎকে কবি অনুভব করিয়াছেন প্রকৃতির মধ্যে। আমি যে আমাকে লইয়া সম্পূর্ণ নই, আমার বাহিরে বিশ্ব যে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের কাছে অহরহই সেই সত্যটি প্রকাশ করিতেছে। আমরা এ সত্যকে সাধারণতঃ শুধুমাত্র ভৌগোলিক সত্য হিসাবে জানি, ইহা আমাদিগকে বিরাটের বোধে কোন আধ্যাত্মিক সত্যের সহিত পরিচিত করায় না। আমাদের অহংসর্বস্ব জীবনকে নাড়া দিয়া বৃহতের মধ্যে নিজেকে স্থাপন করিয়া দেখিতে বলে না। অন্তরের যে অতৃপ্ত ক্ষুধায় বিশ্বপ্রকৃতিকে আপনার আত্মীয় বলিয়া মনে হয় সেই ক্ষুধার অভাব ঘটে। 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি বিশ্বপ্রকৃতিকে লাভ করিবার একটি অভিনব ক্ষুধা প্রকাশ করিয়াছেন। কবি বলিতেছেন, কবি বিশ্বে সর্বত্র আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিবেন। কবির একটি ব্যথিত বাসনা তাঁহার বক্ষপঞ্জরের সংকীর্ণ প্রাচীরের পাষাণবন্ধ বিদীর্ণ করিয়া ছড়াইয়া পড়িতে চায়। সে বাসনাটি হইল এই: বসুন্ধরার জীবন-রসধারা যেখানে যত রূপে প্রাণে গন্ধে গানে নৃত্যে ভাবে উৎসারিত হইতেছে, আপনার চেতনাকে বিকশিত করিয়া, সত্তাকে বিস্তৃত করিয়া, বোধকে রসঘন করিয়া, সে সকলই কবি আস্বাদন করিবেন। কবি বলেন,—

ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা কিছু আছে; নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে

নব নব লোকালয়ে করে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবসে নিশীথে ;

এই ব্যথিত বাসনা, এই অভিনব ইচ্ছা কবিচিত্তে একটি প্রকাণ্ড উল্লাস জাগাইয়া তুলিয়াছে—

ইচ্ছা করিয়াছে—
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে'
সমুদ্র-মেখলা পরা তব কটিদেশ ;

বসুন্ধরাকে বাহুবন্ধনে লাভ করিবার এই যে বাসনা, ইহার মধ্যে কবির প্রেমের একটি গভীর সুর ধরা পড়িয়াছে। এই প্রেম-বেদনায় কবির সত্তা বিস্তৃত হইয়াছে, কবির অস্তিত্ব মানবদেহের বন্ধন মুক্ত হইয়া বিশ্বদেহকে যেন আশ্রয় করিয়াছে। কবি বলিতেছেন—

তাই আজি কোনদিন শরৎ কিরণ
পড়ে যাবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র 'পরে,
নারিকেল দলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা—
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লব নিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়।

বিশ্বকে আপন করিয়া পাইবার বোধটি যেমন অভিনব বিশ্বের সহিত একাত্মীয়তার বোধটিও তেমনি বিচিত্র। বিশ্বের সহিত এই একাত্মীয়তা-বোধের বৈজ্ঞানিক সত্যকে জীব-জীবনের বিকাশতত্ত্বের দিক দিয়া কতখানি সমর্থন করা যায় সে প্রশ্ন এখানে না তুলিয়া, ইহার আধ্যাত্মিক সত্যকে আমরা স্বীকার করিয়া লইব। ভারতীয় দর্শন বিশ্বের সহিত মানবাত্মার অভেদত্বকে যে আধ্যাত্মিকতায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই অধ্যাত্মবাদের অবতারণাও আমরা এখানে করিব না। পাশ্চাত্ত্যের বস্তুবাদ ও প্রাচ্যের ব্রহ্মবাদ, এই দুই তত্ত্বের দিকে না গিয়া, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এই আত্মীয়তাকে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথের এক বৃহত্তর জীবনতৃষ্ণা, তথা গভীর প্রেম-বোধ বলিয়া মানিয়া লইব। বিশ্ব-প্রকৃতির অনির্বচনীয় প্রকাশগুলি আমাদের চিত্তকে মাঝে মাঝে স্পর্শ করিয়া

যায়, আমাদিগকে এক আনন্দবোধে জাগ্রত করে। এই আনন্দের প্রকৃতিটি আধ্যাত্মিক। আমরা যখন ব্যক্তি জীবনকে একান্ত করি, তখন বিশ্বপ্রকৃতির সহিত আনন্দের এই সম্বন্ধে যুক্ত হই না। তখন বিশ্ব আমার কাছে বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহার সহিত কোন আনন্দময় আত্মীয়তা অনুভব করি না। ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখের ঐকান্তিকতা হইতে যত মুক্ত হই, বিশ্বের আনন্দরূপটি আমাদের চেতনায় সঞ্চারিত হইবার তত অবকাশ ঘটে। খাঁচার পাখী যখন আপনাকে লইয়া আছে, তখন সে বনের জগৎ হইতে নির্বাসিত। বনের পাখী আসিয়া তাহাকে বাহিরের সংবাদ দেয়, বৃহত্তর জীবনের আনন্দ আমাদিগকে আহ্বান জানায়। এই আনন্দে আমাদের সত্তা বিস্তৃত হয়, বৃহতের চেতনায় চিত্ত জাগ্রত হয়। বসুন্ধরা কবিতায় বিশ্বপ্রকৃতির সহিত যে একাত্মবোধ তাহা কবি রবীন্দ্রনাথের এক প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে তথা বৃহত্তর জীবন-ধ্যানকেই প্রকাশ করিয়াছে। খাঁচার বাহিরে আসিবার জন্য কবি একটি 'সোনার তরী'র সন্ধান পাইয়াছেন।

তাহা হইলে খাঁচার যে স্বর্ণদণ্ডগুলি আমার কাছে দুরতিক্রমনীয় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেগুলিকে অতিক্রম করিবার একটি হদিস পাইলাম। আপনার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের মধ্যে আমরা বদ্ধ থাকি, বিশ্বপ্রকৃতি তাহার বৃহৎ অস্তিত্ব দিয়া আমাদিগকে সেই বদ্ধ জীবনের বাহিরে আকর্ষণ করিতেছে। এ আকর্ষণে রূঢ়তা নাই, যাহাতে বিশাল বিশ্বের কাছে নিজেকে তুচ্ছ জানিয়া, নগণ্য জানিয়া এবং আপনার প্রতি বিশ্বকে উদাসীন জানিয়া চিত্ত তামসিক বিষাদে আচ্ছন্ন হয়। এ আকর্ষণ আত্মীয়তার আকর্ষণ,—ইহাতে আকাশখানি সুনীল করিয়া, অরণ্যটি শ্যামল করিয়া, মাটিখানি ধূসর করিয়া, বর্ণে গন্ধে গানে দশদিকে নব নব রূপের হিল্লোল তুলিয়া আমার মানবচেতনায় সে কী এক অপূর্ব আনন্দের সঞ্চারণ! আমার প্রতি তাহার সে কি নিবিড় প্রেম! দেখিলাম, সেই বিরাট প্রেম, সেই বৃহৎ প্রেম, এই তুচ্ছ আমাকে, এই ক্ষণিক আমাকে, তাহার প্রাণের পরম ধন মনে করিয়া অহর্নিশি বেষ্টন করিরা আছে। দেখিলাম,—

বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়ন যুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন, মুখে নাহি বাণী।

দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বার প্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্মাহত,
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো।

এই প্রেমবোধে জাগ্রত হইলে আপনার পারিপার্শ্বের আয়তনটি বাড়িয়া যায়, খাঁচার সংকীর্ণ বৃত্তরেখাটি দূর হইয়া বসুন্ধরার দূর দিগন্তরেখাটি স্পষ্ট হইয়া উঠে।

তখন বিশ্ব-জীবনের ভূমিকায় জীবনের সত্যকে দেখিতে পাই। বাহিরের আলোয় আমার প্রদীপটি জ্বলিয়া উঠে, আমার দেবতাও তাহাতে প্রকাশিত হন। যখন বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলাম, তখন আমার সত্যের বোধ সংকীর্ণ, আমার দেবতা তখন মূর্তিমাত্র, পুত্তলিকা মাত্র; তখনও নিদ্রাহীন একচিত্ত হইয়া কত চিত্র রচনা করিয়াছি, ব্যাঘ্রাজিন আসন পাতিয়া শব্দহীন গৃহের মধ্যে বিশ্বজনকে বিস্মৃত হইয়া অন্তহীন রাত্রি যাপন করিয়াছি। কিন্তু সে সকলই বুঝি বৃথা হইয়াছে। দেবতাকে যে দেউলে স্থাপন করিয়াছিলাম, সে দেউলের পরিধি ছিল সংকীর্ণ; দেবতা তাহার মধ্যে ধরেন না;—

রচিয়াছিনু দেউল একখানি
অনেকদিনে অনেক দুখ মানি।
রাখিনি তার জানালা দ্বার
সকল দিক অন্ধকার—
ভূধর হতে পাষাণ ভার
যতনে বহি আনি
রচিয়াছিনু দেউল একখানি॥

কিন্তু সহসা কী এক নিদারুণ অন্তর্দাহে ভুল বুঝিতে পারিলাম! অহংএর বিকারে বাহির হইতে কি এক কঠোর আঘাত আসিয়া পড়িল! সোনার খাঁচাখানি ভাঙ্গিয়া গেল, দেউলের পাষাণরাশি চূর্ণীকৃত হইল, নিদ্রাহীন রজনীর শোকান্ধকারের গ্রাস হইতে, আপনার রচা বহুবিধ সুখস্বপ্নের মোহবন্ধ হইতে পলকের মধ্যে মুক্তিলাভ করিলাম।

অহং জীবনকে একান্ত করিয়া যে দেবতার পূজা করিয়াছিলাম, সেই দেবতা প্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে শ্রেয় ছিল না। প্রেয়ের অধিষ্ঠান ব্যক্তি জীবনের ভূমিকায়, শ্রেয়ের আশ্রয় বিশ্বজীবন। বিশ্বকে বাদ দিয়া এই শ্রেয়ের

ধ্যান তো সম্ভব নয়। শ্রেয়ের ধ্যান বিশ্বকে স্বীকার করিয়া, তাহার জন্য ব্যক্তিকে আপন সুখ দুঃখ তুচ্ছ করিয়া পথে নামিতে হয়। কবিও তাই দেখিলেন,—বিশ্বজীবন চেতনায় জাগ্রত হইয়া, বৃহতের প্রেমে উদ্বেজিত হইয়া এক সোনার তরীতে তিনি যাত্রী হইয়াছেন এবং কবির যে দেবতা মূর্তিমাত্র হইয়াছিলেন, ধূপের ধোঁয়ায় ও 'অগুরুর গন্ধে' যে মূর্তির অনেকখানি ঢাকা পড়িয়া ছিল, সেই দেবতা মধুর হাসিয়া কবির সোনার তরীর নেয়ে হইয়া হালটি ধরিয়া বসিয়া আছেন। কবি গাহিয়া উঠিলেন—

আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী!
বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।

'সোনার তরী'তে কবি উঠিয়া বসিয়াছেন। কোথায় চলিয়াছেন, কিসের অন্বেষণে চলিয়াছেন, তাহা এখনও স্পষ্ট হয় নাই। এখন শুধু যাত্রা সুরু হইয়াছে, কিন্তু কোন্ পারে পৌঁছিবার জন্য যে যাত্রা, সে কথা কবি জানেন না। হয়তো সে পারে নবীন জীবন রহিয়াছে, হয়তো সেখানে স্বর্ণফল আশার স্বপনকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিংবা হয়তো এ সব কিছুই নাই, হয়তো শুধুমাত্র স্নিগ্ধমরণ পথচলার সকল প্রয়াসের অবসানরূপে বিরাজ করিতেছে। মধুরহাসিনী সোনার তরীর সেই নেয়ে যিনি নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া আছেন, তিনিই সে কথা জানেন। তাঁহার সহিত কবির এখনও পরিচয় হয় নাই, এখনও বাক্যালাপ হয় নাই, এখন শুধু—

হুহু করে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জন
জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘন নীল নীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন।

তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ,
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন।
আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার
বিলাস হেন॥

এই মধুরহাসিনী অপরিচিতার বিলাসে কবি বিস্মিত হইয়াছেন কিন্তু সংশয়গ্রস্ত হন নাই। যখন সন্ধ্যা আকাশে স্বর্ণ আলোক ঢাকা, পড়িবে যখন শুধুমাত্র দেহ-সৌরভ, শুধুমাত্র আকুল কেশরাশির স্পর্শ কবিকে ক্ষীণ আশ্বাস দান করিবে, তখন বিকল-হৃদয় বিবশ-শরীর কবি অধীর কণ্ঠে সেই নেয়ের সান্নিধ্য কামনা করিবেন। এখন কবি নেয়ের এই সেনার তরীটিকেই ভাল বাসিয়াছেন, এই সোনার তরীতে উঠিয়া বসিয়া অকূলের দিকে অভিসারটি আস্বাদন করিতেছেন। খাঁচার পাখী সুনীল আকাশে ডানা মেলিয়া দিয়াছে, উড়িবার আনন্দেই তাহার আনন্দ, কোথায় গিয়া পৌঁছিবে এখনও স্থির হয় নাই।

( ২ )

কবি রবীন্দ্রনাথ এই যে সোনার তরীতে আসিয়া বসিয়াছেন,—বৃহতের প্রেমে উদ্বেজিত হইয়াছেন,—এই প্রেম একদিকে যেমন মানব-সমাজ পশু-পক্ষী তরুলতা লইয়া এই বিপুল বিশ্বকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তেমনি এই প্রেম মৃত্যুর বাধাকে অতিক্রম করিয়া মহাকালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অনাদি অতীত হইতে দুজ্ঞেয় ভবিষ্যতের দিকে অনন্তের পথে অভিসার করিতেছে। খণ্ডকালের মধ্যে সে প্রেম আবদ্ধ নয়, জীবনের সংকীর্ণ আয়ুর মধ্যে সে প্রেম নিঃশেষিত হইয়া যায় না, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া সে প্রেম প্রকাশিত। মৃত্যু জীবনকে বার বার গ্রাস করিতেছে, কিন্তু সেই বৃহৎ প্রেমের তাহাতে পরাজয় নাই, অভিনব গীতমূর্তি ধারণ করিয়া তাহা বিশ্বকে ভরিয়া রাখিয়াছে।

মরণ পীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন 'পরে

অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চিরকম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ কুয়াশা
বিশ্বময়।

ব্যক্তি-আমির সুখ-দুঃখ মৃত্যুর অধিকারে, কিন্তু ব্যক্তি-আমি যখন বৃহতের চেতনায় বিকশিত তখন তাহার সুখ-দুঃখের বোধ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া, ব্যক্তি-মানব কালের গর্ভে প্রতিমুহূর্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে—

কে আছে কোথায়, কে আসে, কে যায়;
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়—
বালুকার 'পরে কালের বেলায়
ছায়া-আলোকের খেলা।
জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখ-দুখ-লাজ
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।

ব্যক্তি-জীবন কোথাও চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারিবে না, ব্যক্তি-আমি কোথাও খাতির জমা করিয়া বসিয়া থাকিবে না। শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনে কত ঝড় ঝঞ্ঝা, কত দুঃখ বেদনা, তাঁহার প্রাণের সীতাকে লইয়া সে কী প্রচণ্ড ঘূর্ণী : কিন্তু,—

সে সকল দিন সেও চলে যায়,
সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়—
যায়নি তো এঁকে ধরণীর গায়
অসীম দগ্ধ রেখা।
দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,
সরযুর কূলে দুলে তৃণসার
প্রফুল্ল শ্যামলেখা।

শ্রীরামচন্দ্রের যে বিরাট প্রেম গৃহ সমাজ এবং রাষ্ট্রকে আশ্রয় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল সেই প্রেমই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া আজও ধ্বনিত হইতেছে,—

—সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে-গীত মহাসঙ্গীতে
বাজে মানবের কাণে।

কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী প্রসঙ্গেও সেই একই সত্য প্রকাশিত,—বস্তু জগতে কুরু-পাণ্ডব কোথায় মুছিয়া গিয়াছে, যে ভূমি লইয়া এত সংগ্রাম তাহার আজ চিহ্ন মাত্র নাই, তবু মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াও সেই কুরু-পাণ্ডব কেমন করিয়া আজও বাঁচিয়া আছে—

তবু কোথা হতে আসিছে সে স্বর
যেন সে অমর সমর সাগর
গ্রহণ করেছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে ;
বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,
সফল আশার বিষাদ মহান,
উদার শান্তি করিতেছ দান
চিরমানবের প্রাণে।

জীবনকে বৃহৎ করিয়া দেখিতে হইবে, প্রেমকে উদার করিয়া অনুভব করিতে হইবে, তবেই আমাদের জীবনের কিছু কিছু গান আমরা রচনা করিয়া যাইতে পারিব, ধরণীর শ্যাম করপুটখানি সেই গান দিয়া ভরিয়া দিতে পারিব। বৃহৎকে আশ্রয় করিয়া আমাদের জীবনের যা কিছু প্রকাশ সে সকলি দেশ হইতে দেশান্তরে কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিবে, কিন্তু নিজেকে কেন্দ্র করিয়া যাহা কিছুই রচনা করি না কেন, তাহা ধুলির সাথে মিশিয়া ধুলি হইয়া যাইবে। 'সোনার তরী' আসিয়া যে-কবিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, সে-কবি হইলেন কবির 'ছোট আমি' ; সে-আমি নিজেকেই বড়ো করিয়া জানে সে-আমি মৃত্যুকে জয় করিবার বৃথাই স্পর্ধা করে, কিন্তু 'সোনার তরী'তে তাহার ঠাঁই মেলে না, বিশ্ববিধানে কোথাও তাহার নজির নাই।—

রাজছত্র ভেঙ্গে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে ;
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি,
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

'সোনার তরী'তে যে-কবি যাত্রী, নেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময় ব্যাকুল চিত্তে যিনি বসিয়া আছেন, সে-কবি হইলেন কবির 'বড়ো-আমি'। কবির 'ছোট-আমি'কে সোনার তরী প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, কিন্তু যে-কবি তরীতে আসিয়া উঠিয়াছেন সেই কবিকে এই নেয়ে নানা ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া শুধু কবির এই জন্মেই একপার হইতে অন্যপারে লইয়া যাইবেন না, বহুযুগের মধ্য দিয়া বহু শতাব্দীর মধ্য দিয়া তিনি কবিকে বাহিয়া লইয়া চলিবেন।

কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবনের এই অভিনব অভিসার কবির নিকট এখনও তেমন স্পষ্ট হয় নাই। যদিও কবি বলিয়াছেন, "দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে" তবু সেই নেয়ে এখনও কবির অপরিচিতা। তাঁহার তত্ত্ব, তাঁহার রহস্য কবির কাছে এখনও উদ্ঘাটিত হয় নাই, নেয়েকে কবি এখনও তাঁহার অন্তরতম বলিয়া, তাঁহার জীবন দেবতা বলিয়া বুঝেন নাই। এখন কেবল নেয়ের সোনার তরীটিকে কবির ভালো লাগিয়াছে; সেই সোনার তরীতে উঠিয়া বসিয়া অকূলের দিকে যাত্রা করিতেও একটা রোমাঞ্চ অনুভব করিতেছেন। যে খাঁচার জীবনে কবি বদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সোনার খাঁচার পরিবর্তে এই যে একটি সোনার তরী পাইয়াছেন,—ইহাই কবির পরম আনন্দ।

'সোনার তরী' তাই কবি রবীন্দ্রনাথের একটি অভিনব মানস-যান। কবির জীবন-দেবতা—যাঁহার পরিচয় এখনও কবির নিকট স্পষ্ট হয় নাই—এই মানস-যানটির কর্ণধার হইয়া বসিয়া আছেন এবং এই সোনার তরীতে করিয়া কবি প্রেয়োজীবন হইতে শ্রেয়োজীবনের দিকে অহং হইতে বিশ্বের দিকে যাত্রা সুরু করিয়াছেন। 'সোনারতরী' কাব্যে রবীন্দ্র-মানসের যে চিত্র আমরা লাভ করিয়াছি তাহাতে 'সোনার তরী'র এমনই একটি শিল্প সম্মত ব্যাখ্যা আমাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে। 'তরী' কথাটির মধ্যেও নদী, সমুদ্র এবং খেয়া পাড়ির ভাব জাগিয়া উঠে। নৌকার চিত্রের মধ্যেই তাই একটি দূরের দিকে যাত্রার কথা মনে হয়। কবি যে সমুদ্রের দিকে পাড়ি দিবেন তাহার ইঙ্গিত পাই কাব্যের নাম করণের মধ্যে। 'সোনার' এই বিশেষণে তরীর মূল্য ও প্রিয়ত্বের নির্দেশ আছে। তাই মনে হয় দূরের এই যাত্রায় কবি রস পাইয়াছেন, ইহাকে আস্বাদন করিয়াছেন।

'সোনার তরী' শীর্ষক কবিতাটি রচনার প্রায় পনেরো বৎসর পরে কবি স্বয়ং সোনার তরীর একটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কবি বলিতেছেন—"সংসার আমাদের জীবনের সমস্ত কাজ গ্রহণ [illegible] কিন্তু আমাদিগকে তো গ্রহণ করে না।

আমার চিরজীবনের ফসল যখন সংসারের নৌকায় বোঝাই করিয়া দিই তখন মনে এ আশা থাকে যে, আমারও ঐ সঙ্গে স্থান হইবে, কিন্তু সংসার আমাদিগকে দুই দিনেই ভুলিয়া যায়।"

এখানে স্পষ্ট দেখিতে পাই, 'সোনার তরী' বলিতে কবি "সংসারের নৌকা" বুঝাইয়াছেন। আমরা 'সোনার তরী'কে subjective করিয়া দেখিয়াছি; সোনার তরী হইল বৃহতের চেতনা—বৃহত্তর জীবনবোধ বা প্রেমবোধ—তথা বিশ্ববোধ। এই বিশ্ববোধে জাগ্রত হইয়া কবি মহাকালের অভিমুখে ভাসিয়া চলিলেন। কবি খাঁচার জীবনে আছেন—তাহা হইল—"এপারেতে ছোট খেত, আমি একেলা।"—ইহার ব্যাখ্যায় কবি বলিতেছেন—"একলা নয় তো কী। আমরা প্রত্যেকেই যে একলা—আমাদের প্রত্যেকের চারিদিকে যে অতলস্পর্শ স্বাতন্ত্র্যের ব্যবধান আছে, তাহা কে অতিক্রম করিবে। এই ব্যবধানের মধ্যে, প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের অন্তরালে আপনার জীবনের ক্ষেত্রটুকু লইয়া কাজ করিয়া যাইতেছি···"। বলাবাহুল্য এই 'ছোট খেতের' জীবন হইল খাঁচার জীবন, এই একাকিত্ব হইল ব্যক্তির অহং জীবনের একাকিত্ব।—কবি বলেন সংসারের তরণীতে এই অহং স্থান পায় না, কিন্তু 'আমাদের সেবা,' 'আমাদের প্রেম' স্থান পায়। 'সোনার তরী'কে কবি এই ভাবে এখানে objective করিয়া দেখিয়াছেন এবং 'প্রেম,' 'সেবা' প্রভৃতি 'সোনার ফসল' গুলিকে সেই তরণীর পসরা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই ভাবে দেখিবার জন্য সেই সোনার তরীর নেয়েরও objective পরিকল্পনাই পরিস্ফুট হইয়াছে—"সে আমার সব লয় কিন্তু আমাকে লয় না। আমাদের সকলের কুড়াইয়া লইয়া সে কোথায় চলিয়াছে তাহা কি আমরা জানি! সে যে অনির্দিষ্টের দিকে অহরহ যাইতেছে তাহার কূল কি আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু তবু এই নিরুদ্দেশ যাত্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই অপরিচিত অথচ পরিচিত মানব সংসারকেই আমাদের যাহা কিছু সমস্ত দিয়া যাইতে হইবে।"

'সোনার তরী'কে সংসারের তরণী এবং সোনার তরীর নেয়েকে সাংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া কল্পনা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার ধ্যান যখন বিশ্বদেবতার ধ্যানে পর্যবসিত হইয়াছে, সেই নৈবেদ্য-শান্তিনিকেতনের পর্যায়ে কবি সোনার তরীর নেয়েকে আত্মগত ভাবে ধ্যান করেন নাই। 'সোনার তরী' তখন বৃহত্তর-জীবন-চেতনা মাত্র নহে, তাহা তখন বিশ্বজীবন-স্বরূপ; এবং সেই মধুরহাসিনী অপরিচিতা নেয়ে কবির আর

একান্ত আপনার নহেন, তিনি তখন বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইলেও এই objective ধ্যান-কল্পনা 'সোনার তরী' কাব্যে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। চিত্রা কাব্যে যেখানে রূপলোক ও ভাবলোক, এই দুইটি জগৎ কবির কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তখন জীবন-দেবতাকে 'জগতের মাঝে বিচিত্র রূপিণী', এবং 'অন্তরমাঝে একা একাকী' এই উভয় মূর্তিতেই দেখিয়াছেন। 'সোনার তরী' এবং 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' এই দুই কবিতার মধ্যে যথাক্রমে বাহির এবং অন্তর এই দুই পরিবেশ রহিয়াছে। কিন্তু প্রথম কবিতাটিতে সোনার তরীর objective ব্যাখ্যা পরিস্ফুট হইলেও এই পর্যায়ে রবীন্দ্রমানসের পটীভূমিকায় মিলাইয়া দেখিলে 'সোনার তরী'র sbjective রূপ তথা মানসচিত্রটিই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা দেখিব, সোনার তরী হইল কবি রবীন্দ্রনাথের একটি বৃহত্তর জীবন বোধ বা প্রেম চেতনা ; জীবনদেবতা কবিকে বৃহত্তর জীবনবোধে উন্নীত করিয়া কবিকে জীবনের পথে বাহিয়া লইয়া যাইতেছেন, বৃহতের ভূমিকায় আমরা যাহা করি তাহাই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া পথ চলিতে থাকে, কিন্তু আমাদের অহং চেতনা, আমাদের ছোট-আমি এই বৃহত্তর জীবনে স্থান পায় না, তাহা আপনার ছোট ক্ষেতটিতে আপনার সোনার খাঁচাটিতে পড়িয়া থাকে। এই বৃহত্তর জীবন-চেতনা—যাহা বোধমাত্র, যাহা subjective, তাহাই পরে বিশ্বজীবনের বাস্তব ভূমিকা লাভ করিয়াছে—এবং জীবনদেবতা বিশ্বদেবতায় পরিণত হইয়াছেন।—'সোনার তরী' হইতে 'চিত্রা' কাব্যের মধ্য দিয়া আমরা এই পরিণামে উপনীত হই।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## *চিত্রা : জীবন-দেবতা*

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের মূল ভাবটিকে ধারণ করিয়া আছে; এইজন্য জীবনদেবতার আলোচনায় সামগ্রিক-ভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের উপর দৃষ্টি ফেলিতে হয় বলিয়া প্রথম হইতে মূল ভাবটিকে যথাযথ ধরিতে না পারিলে প্রতি মুহূর্তে ভুল হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রসাহিত্য একটি বিশেষ জীবনবোধ হইতে উদ্ভূত হইলেও তাহা এত বিচিত্রতা বিস্তার করিয়াছে যে, সেই বৈচিত্র্যগুলিকে খণ্ডভাবে দেখিলে বা বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে তাহাতে বিভিন্ন অর্থ বাহির হইয়া পড়ে এবং সেগুলি সব সময়ে আমাদিগকে মূল ধারাটির সহিত পরিচিত করাইয়া দিতে পারে না; উপরন্তু সেগুলিকে অনেক সময় পরস্পরের অত্যন্ত বিরোধী বলিয়া মনে হয়। অথচ মূল সত্য সম্বন্ধে কবি নিজে কোনদিন ভুল করেন নাই বা কোনখানে ফাঁকি রাখেন নাই; কাব্যে উপন্যাসে নাটকে প্রবন্ধে এই সত্যটিকে অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মূল সত্যটিকে কবি এমনভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং জীবনের মধ্যে তাহা এরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, তাঁহার সকল প্রকাশের মধ্যে তাহা কখন জ্ঞানদৃপ্ত ওজস্বিতায়, কখনও গভীর সৌন্দর্যে-ব্যঞ্জনায়, আবার কখনও লঘু হাস্যোচ্ছ্বাসে ক্ষণে ক্ষণে স্ফুরিত হইয়াছে। মূল সত্যটিকে চিনিলে এই ক্ষণিক, খণ্ড স্ফুলিঙ্গগুলি আমরা ধরিতে পারি; বুঝিতে পারি, স্ফুলিঙ্গগুলি একই আলোকউৎস হইতে নির্গত হইতেছে।

এই জীবনদেবতাকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বরূপ জানেন নাই, পরন্তু তাহাকে একটি ভাব বা idea হিসাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই জীবনদেবতা প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-জ্ঞান বলিব না, জীবন দেবতা-বোধ বলিব। আমরা তত্ত্বকে জানি, কিন্তু ভাবকে উপলব্ধি করি। তত্ত্ব বলিতে বুঝি এমন জিনিষ, যাহা বিচারের দ্বারা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়; আর ভাব বলিতে বুঝি এমন জিনিষ যাহা অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধির দ্বারা বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটিতে থাকে reason ও intellect, আর একটিতে থাকে emotion ও intuition। একটি সত্যকে নির্দিষ্ট করে, আর একটি সত্যকে স্বীকার করে।

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি সত্যের সন্ধানে স্বাভাবিকভাবে দ্বিতীয় পন্থাটি অনুসরণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-বোধের প্রকৃতি ও বিশিষ্টতা নিরূপণ করিবার পূর্বে আমাদিগকে প্রথমে সেই মূল সত্যটিকে চিনিতে হইবে, যেখান হইতে কবি এই ভাবধারাটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পরে দেখিতে হইবে সত্যটি তাহার মধ্যে কিরূপে প্রকাশ পাইয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

মূল সত্যটি হইতেছে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ বা আত্মবাদ। কি উপায়ে পরম কল্যাণ হইতে পারে, ইহা অপেক্ষা আর কোন গুরুতর প্রশ্ন মানুষের নাই। ভারতীয় ঋষিগণ আপনাদের জ্ঞান-তপস্যায় ইহার উত্তর দিয়াছেন। উপনিষদ বলেন, পৃথিবীতে যাবতীয় পদার্থকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—বিষয়ী ও বিষয়। বিষয়ী আমি আমাকে সর্বতোভাবে প্রাকৃতিক শক্তির বা বিষয়ের অধীন বলিয়া মনে করি; কিন্তু তাহা অধ্যাসমাত্র। প্রকৃত সম্বন্ধ ইহার বিপরীত, বিষয় আমার মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে, সে এ সকলের ঊর্ধ্বে। এই আত্মা বা বিষয়ী সমস্ত বাহ্যজগৎকে আপনার বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করিয়া গ্রহণ করিতেছে। "যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আত্মা আপনার জ্ঞানরাশিকে আপনা হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করে; আপনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জ্ঞেয় পদার্থে পরিণত করে, তাহার নাম দার্শনিক সৃষ্টি।" এই আত্মা স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ, তাহার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই। এই দিক দিয়া দেখিলে আত্মাকে জগতের স্রষ্টা, নিয়ন্তা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ ঠিক নহে। পরমার্থতঃ আত্মা কিছুই করে না। ঐন্দ্রজালিক কাটামুণ্ডে কথা কহায় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা বোধমাত্র; ঐন্দ্রজালিক তাহা করে না। অতএব আত্মা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, শুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ জীব।

এই বিষয়ীকে দুইটি নামে আখ্যাত করা হয়। বিষয়ী আত্মা সম্পূর্ণ অবিষয় নহে; সম্পূর্ণ অপ্রত্যক্ষ নহে। আমি একধারে বিষয়ী ও বিষয়। আমি যেমন অন্যান্য বিষয়কে জানি, তেমনি আমাকেও জানি। আমি একদিকে জ্ঞাতা আমারই জ্ঞেয়। এই বিষয় আমার বা জ্ঞানগম্য আমার পারিভাষিক নাম জীবাত্মা : আর এই বিষয়ী আমার বা জ্ঞাতা আমার পারিভাষিক নাম পরমাত্মা। এই জ্ঞাতা আমি নির্বিকার নিষ্ক্রিয়; আর জ্ঞেয় আমি পরিবর্তনশীল, বিকারশীল জড়জগৎ কর্তৃক অভিভূয়মান। কিন্তু এই উভয় আমি একই পদার্থ, উহা একেরই দুই বিভিন্ন অবস্থা। ইহাই বেদান্তের অদ্বয়বাদ। এই অদ্বয়তত্ত্ব যে জানে সে মুক্ত, যে জানে না সে বদ্ধ। এই মুক্তির একমাত্র উপায় জ্ঞান : নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এই যে সোঽহম্ তত্ত্ব, ইহাতে মুক্তির জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা বলা হইয়া থাকে এবং রূপজগতের স্বার্থকতা অস্বীকার করা হয়। চোখের সম্মুখ হইতে রূপজগতের মায়া আবরণ সরাইয়া ফেলিয়া পরম সত্যকে বিশুদ্ধ জ্ঞানে উপলব্ধি করাই ইহার উপদেশ। এই পরম সত্যের আশ্রয় কোথায়—গার্গীর এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মবিদ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অক্ষর বলিয়া থাকেন; তিনি স্থূল নহেন, অনু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, অন্ধকার নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন। তিনি অসঙ্গ, তিনি রসহীন, গন্ধহীন, চক্ষুহীন, কর্ণহীন, বাগিন্দ্রিয়হীন, মনোহীন, তেজোহীন, প্রাণহীন, মুখহীন, মাত্রাহীন। তাঁহার ভিতর নাই, বাহির নাই।

এই যে নিরুপাধিক সত্তা, আমাদের বিষয়গত বুদ্ধি ও মন দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করা যায় না। ইনি সকল মানসিকতার অতীত। তিনি কিরূপ তাহা যেমন ব্যাখ্যার অতীত, তাঁহার সহিত মিলনের অবস্থাও সেইরূপ ব্যাখ্যার অতীত। বৈদান্তিক বলেন, সে অবস্থা রূপরসগন্ধহীন এক নৈর্বক্তিক, নির্গুণ, তুরীয় অবস্থা, তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারে, এরূপ বোধের অস্তিত্ব নাই।

জ্ঞানমার্গের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সোঽহম্ তত্ত্বকে বৈষ্ণবসাধকগণ আর এক অভিনব পন্থায় ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহারা 'সোঽহম্' তত্ত্বকে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু বৈদান্তিকের ঐ জ্ঞানমুক্তির তাৎপর্য ও সার্থকতা মানিয়া লইতে পারিলেন না। বৈষ্ণব বলেন, রসরাজ আপনার আনন্দকে উপলব্ধি করিবার জন্য নানা বৈচিত্র্যে বিশ্বজগতে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। জীব তাঁহার অংশ—সোঽহম্ জ্ঞান জীবের প্রয়োজন। কিন্তু সেই জ্ঞানে সে আপনার জীব-

সত্তাকে রসরাজের মধ্যে লীন করিয়া দিয়া আপনার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিবে না, পরন্তু আপনার মধ্যে এবং বিশ্বজগতের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁহাকে অনুভব করিয়া তাঁহার আনন্দময় প্রকাশকে রক্ষা করিয়া চলিবে। ইহাতে জীব রূপেরসে তাঁহাকে ভাবের মধ্যে অনুভব করিবে। এই রূপজগৎকে যদি মায়া বলিয়া ব্যর্থ করি, তবে সেই রসরাজের আনন্দকে অস্বীকার করা হইবে, কিন্তু এই রূপজগতের মধ্যে যদি তাঁহার আনন্দকে আবিষ্কার করিয়া তাহা রক্ষা করিয়া চলি, তবে তাঁহার লীলাকে সার্থক করিব। এইজন্য বৈষ্ণবগণ সোঽহম্ মন্ত্র স্বীকার করিয়াও দ্বৈততাকে প্রাধান্য দেন। ইহারই জন্য পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে মিলনের অবস্থাকে বৈদান্তিক নির্গুণ ও কোন প্রকার বোধের অতীত বলিয়া বর্ণনা করেন, সে অবস্থাকে বৈষ্ণব এক আনন্দময় রসাবস্থা বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যকার ব্যবধানটুকু লীলা প্রকাশের আনন্দরসে পরিপূর্ণ। ভক্ত উচ্চেতন মন দিয়া এই রস আস্বাদনে তাঁহার সহিত মিলিত হন। কিন্তু এই মিলনই সবচেয়ে বড় কথা নয়। নানা বিচিত্র প্রকাশে রসরাজ এই রসসমুদ্রের ব্যবধানটি সৃষ্টি করিয়াছেন,—এপার হইতে ভক্ত নিত্যনূতন আস্বাদনের মধ্য দিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে, ওপার হইতে তিনিও নিত্যনূতন বিচিত্রতা সম্পাদন করিয়া আপনার লীলা প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে মিলন অপেক্ষা মাথুরই মধুর হইয়া উঠিয়াছে। জীবাত্মা যে অবস্থায় তাঁহার সহিত এই রস-সম্ভোগের সম্বন্ধে যুক্ত হয়, তাহাও অতি উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিকতা, তাহাও এই স্থূল বিশ্ব হইতে মুক্তি, কিন্তু ইহা বৈদান্তিকের জ্ঞানের মধ্যে মুক্তি নহে, তাহা বৈষ্ণবের ভাবের মধ্যে সাযুজ্য লাভ।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনসাধনায় এই ভাবমার্গ অবলম্বন করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই বৈষ্ণবোচিত ভাব-সাধনার কথা দেখিতে পাই এবং ইহাতে রবীন্দ্রনাথকে সময় সময় পরম বৈষ্ণব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে, রবীন্দ্রনাথের সাধনা বৈষ্ণবের মতন বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু ইহা প্রকৃত বৈষ্ণবের সাধনা নহে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বৈষ্ণব নহেন।

বৈষ্ণবগণ নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে ভাবের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে লাভ করিবার জন্য রূপকে এবং রূপের ভেদকে স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকল রূপের মধ্য দিয়া তাঁহারা সেই একই রসরাজের লীলা অনুভব করিতে গিয়া পার্থিব

সকল সংস্কারের উর্ধ্বে উঠিয়াছেন। আমাদের মনের অনুভূতির বহুবিধ বিচিত্র রূপ রহিয়াছে। তাহার মধ্যে যে পাঁচটিকে তাঁহারা প্রাধান্য দেন তাহা হইল—রতি, প্রীতি, প্রেম, ভাব ও মহাভাব। প্রেমের পর্যায়ে সাধক মনের অধীনে থাকেন, তখন এই লৌকিক মানসিকতাতেই রূপকে উদারচিত্তে গ্রহণ করেন এবং রূপের আনন্দ আস্বাদন করেন। ইহা লৌকিক মনের ভোগ। কিন্তু প্রেমের উপরের স্তরে ভাব ও মহাভাব অবস্থায় সাধক মনের অধীনে থাকেন না, এই লৌকিক মনের উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়া রূপের সহিত একাত্ম হইয়া যান। বৈষ্ণবসাধকগণ বলেন যে, তখন রূপোপলব্ধি এক উচ্চেতন মনেতে হয়। ইহাকে তাঁহারা মনের ভিতরের মন বলিয়াছেন। ইহা সাধারণ লৌকিক মানসিকতা নয়, ইহা অলৌকিক। এই মানসিকতায় সাধক রূপের সহিত একাত্ম হইয়া যান বলিয়া তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ ভেদ বিলুপ্ত হয়, অন্য জড় বস্তুর সহিত তিনি নিজেকে একাঙ্গ করিয়া দেখেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বৈষ্ণব সাধকের এই অলৌকিক মানসিকতা গড়িয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রসাহিত্যে কোথাও এমন কথা নাই যে, রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী-পুরুষের ভেদ ভুলিয়াছেন বা আপনার লৌকিক সত্তাকে বিস্মৃত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-সাধন-পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন সাধনার তৃতীয় স্তর প্রেমের স্তর পর্যন্ত। লৌকিক মানসে রূপকে যত বৈচিত্র্যে, যত রূপে রসে, গন্ধে উপভোগ করা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাহা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন বলিতেছেন—

"যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই
যা পেয়েছি যা দেখেছি তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে
যে শতদল পদ্মরাজে
তারই মধু পান করেছি, ধন্য আমি তাই।"

তখন এই জ্যোতিসমুদ্র বৈদান্তিকের বা বৈষ্ণবের উপলব্ধ কোন অলৌকিক জ্যোতিসমুদ্র নয়,—যে জ্যোতিসমুদ্রে নৈর্ব্যক্তিক নিরুপাধিক সত্তা আপনাকে বিস্তার করিয়াছেন, যাহাকে এই লৌকিক মন দিয়া কোনরূপেই বুঝিয়া উঠা যায় না। রবীন্দ্রনাথ লৌকিক মানস রাজ্যের বাহিরে কোনদিন যাইতে চাহেন নাই, ইহার বাহিরে কি আছে, তিনি বলিতে পারেন না। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, যে, যেহেতু তিনি পৃথিবীর কবি, সেহেতু এই জগতের কথা লৌকিক মন দিয়াই তাঁহাকে বলিতে হইবে। ইহার বাহিরে যাইবার অধিকার তাঁহার

নাই, তিনি যাইতেও চাহেন না। এসম্বন্ধে 'মানবসত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—'যিনি সর্বজগদ্‌গত ভূমা' তাঁকে উপলব্ধি করার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, 'লোকালয় ত্যাগ করো, গুহাগহ্বরে যাও, নিজের সত্তা সীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হও।' এই সাধনা সম্বন্ধে কোন কথা বলার অধিকার আমার নেই। অন্ততঃ আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে, তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহাপুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে। তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোন অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হবার কথা যদি কেউ বলেন তবে, সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছড়াতে পারে না। আমরা যাকে বলি বিজ্ঞান, তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি, তা মানবের চৈতন্যতে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে এই আনন্দে যাকে উপলব্ধি করি, তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা।" বৈদান্তিক ও বৈষ্ণব উভয়ের সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের এইকথা। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মানব মন দিয়া রূপদর্শনের কথা 'শান্তি নিকেতনে'র একটি বাণীতে অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন— "আমি বলিতেছি, এই চোখ দিয়ে, এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে, যা চরম দেখা। তাই যদি না থাকত, তবে এত বড়ো এই গ্রহ-তারা-চন্দ্রসূর্য খচিত প্রাণে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বিশ্বজগৎ বৃথা আমাদের চারিদিকে অহোরাত্র আত্মপ্রকাশ করছে।...কাকে দেখবে? তাঁকে যাকে ধ্যানে দেখা যায়? না তাঁকে না, যাঁ'কে চোখে দেখা যায়, তাঁ'কেই। সেই রূপের নিকেতনকে যাঁ'র থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্তকাল থেকে ক্ষরে পড়ছে। চারিদিকেই রূপ, কেবলই একরূপ থেকে আর এক রূপের খেলা... সেই অপরূপ অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলায় যখন দেখব, তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমার চোখ মেলা সার্থক হবে।"

অথচ রবীন্দ্রনাথ স্থানে স্থানে অসীমের অরূপের উপলব্ধির অবস্থা এভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহা ঔপনিষদিক সমাধি অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়;—

"বর্ণে বর্ণে সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্রখানি
ধীরে ধীরে মৃদু হস্তে লও তুমি টানি

সর্বাঙ্গ হৃদয় হ'তে ; দীপ্ত দীপাবলী
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে ছিল যা উজ্জ্বলি
দাও নিবাইয়া ; তার পর অর্ধরাতে
যে নির্মল মৃত্যু শয্যা পাত নিজ হাতে—
সে বিশ্বভুবনহীন নিঃশব্দ আসনে
একা তুমি বসো আসি পরম নির্জনে।"

এই অরূপের আসন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চার ক্ষেত্র, সেথা শুভ্রভাস ;
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই—নাই নাই বাণী।"

মনে হয় ইহা যেন, গার্গীর প্রশ্নেরই উত্তর, যাহা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এই যে জগতের কথা বলিয়াছেন, তাহা লৌকিক মনের আয়ত্তাধীন নয়, তাহা সমাধিস্থ পুরুষের মনোলোকের অতীত একটি ভূমি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিতেছেন, তাহা লৌকিক মনেরই বোধগম্য বিষয়। যথার্থ ব্রহ্মলীন অবস্থায় যে সমাধি হইয়া থাকে, কবি রবীন্দ্রনাথের সে সমাধি কখনও হয় নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। উপরে কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ধ্যানগম্ভীর হইলেও কবির লৌকিক মনের অনুভূতি বা কল্পনামাত্র, তাহার সহিত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের অনুভূতি ও উপলব্ধির মিল নাই।

এইরূপে দেখি, জীবন সাধনায় রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানের পথ অবলম্বন করেন নাই, আবার ভাবের পথ অবলম্বন করিয়াও বৈষ্ণব সাধকের মতন সাধনার গভীরে প্রবেশ করেন নাই। মনের অতীতে কেন যে রবীন্দ্রনাথ যাইতে চাহেন নাই, তাহার কারণটি খুব সুস্পষ্ট এবং রবীন্দ্রনাথ বারবার তাহা নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। আসল কথা হইল, রবীন্দ্রনাথ বৈদান্তিকের মত বা বৈষ্ণবের মত কোনদিনই মুক্তি বা সাযুজ্য কামনা করেন নাই। সর্বপ্রকার সংস্কার মুক্ত হইয়া জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইয়া পরম-পুরুষের সহিত একাত্ম হইয়া যাইবেন— এরূপ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের কোনদিন ছিল না। জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা লীলায়িত এই পৃথিবীকে কবি ভালবাসিয়াছেন ; কবি 'অমরতাকূপে' বদ্ধ হইতে চাহেন না। কবি নবনব মৃত্যু পথে বিশ্বদেবতাকে জীবনের মধ্যে নিত্যনূতন ভাবে পূজা করিতে চান—

"কোথা হতে আসিয়াছি নাহি পড়ে মনে
অগণ্য যাত্রীর সাথে তীর্থ দরশনে
এই বসুন্ধরা তলে ; লাগিয়াছে তরী
নীলাকাশ-সমুদ্রের ঘাটের উপরি।

* * *

এখন মন্দিরে তব এসেছি হে নাথ
নির্জনে চরণতলে করি প্রণিপাত
এ জন্মের পূজা সমাপিব। তারপর
নবতীর্থে যেতে হবে হে বসুধেশ্বর।"

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-সমাধি কামনা করেন নাই, অথচ রবীন্দ্রসাহিত্যে মুক্তির বাণী রহিয়াছে। এই মুক্তির তাৎপর্য কি ; রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের আশ্রয় কোথায়, রবীন্দ্রনাথ অরূপ অসীম বলিয়া যাঁহাকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠা কোনখানে ? এই সকল বিষয়ে অবহিত হইলে আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবন, দেবতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিতে পারিব।

(২)

উপনিষদের সোঽহম্ তত্ত্বটিকে কবি রবীন্দ্রনাথ একটি লৌকিক ভূমিকায় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অন্তরের দেবতাকে এক নূতনভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহার মুক্তির বাণীও অভিনব অর্থ লাভ করিয়াছে। দেবতালাভের সঙ্গে মুক্তিলাভ কথাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। রবীন্দ্রনাথের দেবতা ঔপনিষদিক নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন, এবং যে মুক্তিপথে তাঁহাকে লাভ করা যায় তাহাও বৈদান্তিকের ব্যাখ্যাত মুক্তি নহে। এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া বিশ্লেষণ করিলে আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাকে বুঝিতে পারিব এবং ইহাতে একটি বিষয় সুপরিস্ফুট হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা যে স্তরেই পর্যবসিত থাকুক না কেন, তাহাতে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে কোথাও ফাঁকি নাই, কোনও দ্বৈধতা নাই। অথচ সত্যটির প্রকৃতিই এরূপ যে, তাহা কবি চিত্তকে কোনদিন নিদ্বন্দ্ব করিতেছে না। সত্যকে যেভাবে উপলব্ধি করিয়া শ্রীরাধা বলেন—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ"
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মানলু"
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।"—

রবীন্দ্রনাথ সেভাবে উপলব্ধি করিয়া নিদ্বন্দ্ব হইতে পারেন নাই। রবীন্দ্র-কাব্যে নানা বিরোধ দেখি বটে, কিন্তু তাহা এই উপলব্ধির বৈশিষ্ট্যের জন্য—তাহা মূল সত্যের মধ্যকার কোন বিরোধের জন্য নহে।

'কড়ি ও কোমলের' মধ্যে মানুষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এইরূপ একটি শ্লোক পাই—

"চারিদিকে তার মানব মহিমা
উঠিছে গগন পানে
খুঁজিছে মানব আপনার সীমা
অসীমের মাঝখানে।"

এই শ্লোকটিতে মানুষের যে রহস্য কবি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং মানুষের মহিমাকে যে শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার একটি গভীর বোধ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কাব্যজীবনের নবীন প্রত্যুষে এই যে ভাবের অঙ্কুরটি দেখিতে পাই, পরবর্তী কালে তাহা জীবনের বিচিত্রজ্ঞান ও উপলব্ধির মধ্য দিয়া কবির মানসলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। মানুষের কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনের দৈন্য সম্পদ মিলাইয়া মানুষের মহিমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত আবিষ্কার করিয়াছেন এবং একথা বার বার ঘোষণা করিয়াছেন যে, মানুষ আপনার সকল ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আপনার মহিমাকে প্রতিষ্ঠা করিতেছে, প্রচার করিতেছে। তাহাই যদি না হইবে, তাহা হইলে মানুষের অভিব্যক্তির কোনই অর্থ থাকে না। "মানুষের ধর্ম" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটিকে গভীর জ্ঞাননৈপুণ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, মানুষ শুধুমাত্র তাহার ব্যক্তি সীমাতে সীমাবদ্ধ নয়। সে-সীমা ছাড়াইয়া সে বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও সকলের সঙ্গে যুক্ত। এই ঐক্যকে, এই বৃহৎ মহামানবিক সত্তাকে উপলব্ধি করাই মানুষের সাধনা। আমাদের হৃদয়ে এমন কে একজন আছেন, যিনি মানব, অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করিয়া 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট' তিনি সর্বজনীন, সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায়, ভাবে, কর্মে সর্বজনীনতার

আবির্ভাব। এই সত্যকে আমরা ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করি আমাদের সঙ্কল্পে, আমাদের ধ্যানে, আমাদের আদর্শে। প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমরা যা ইচ্ছা করি, সেই প্রেয়ের ইচ্ছা আমাদের স্বভাবে বর্তমান, আবার যাহা ইচ্ছা করা উচিত, সেই শ্রেয়ের ইচ্ছাও মানুষের স্বভাবে। শ্রেয়কে গ্রহণ করার দ্বারা মানুষ কিছু একটা যে পায় তাহা নয়, কিছু একটা হয়। এই শ্রেয়ের সাধনাই মানুষের মহিমার পরিচায়ক, তাহা না হইলে শুধুমাত্র প্রেয়ের সাধনায় মানুষ হীন হইয়া যায়। এই হওয়ার দ্বারা পাওয়ার মধ্যেই বুঝা যায় যে, মানুষের যাহা চরম পাওয়ার বিষয়, তাহার সহিত মানুষ একাত্মক, মানুষ তাহারই মধ্যে সত্য।

এইরূপে একটা শ্রেষ্ঠতার দিকে মানুষের অভিব্যক্তিকে কবি রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিয়াছেন। এই শ্রেষ্ঠতা ব্যক্তিগত মানুষকে আশ্রয় করিয়া নাই। তাহা মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এবং সর্বদেশ ও সর্বজনকে ব্যাপৃত করিয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন,—অতীতে দেবতার কল্পনায় মানুষ তাহার এই আদর্শকে অখণ্ড বিশুদ্ধ আকারে স্থাপন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতের মধ্যে তাহাকেই প্রকাশ করিতে চাহিতেছে। এই শ্রেয়ের সাধনাই মানুষের সাধনা। কিন্তু মানুষের মধ্যে দুইটি ভাব—একটি জীবভাব, আর একটি বিশ্বভাব। জীবভাবের প্রকাশ ভৌতিক পৃথিবীতে, বিশ্বভাবের প্রকাশ আত্মিক জীবনে। একদিকে তাহার স্বার্থের-যোগ, আর একদিকে তাহার আনন্দের যোগ! এই আনন্দের যোগে ত্যাগের মধ্যে আত্মার লক্ষণ স্বীকৃত হয়। এই আত্মার প্রকাশেই মানুষ মহৎ, একথা মানুষ বুঝিয়াছে। মানুষ জ্ঞানে, কর্মে ও প্রেমে যে পরিমাণে এই আত্মাকে প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে তার মহিমার প্রতিষ্ঠা হয়। ব্যক্তিগত ভাব হইতে বিশ্বগতভাবে, এক স্বভাব হইতে স্বভাবন্তারের সাধনাই মানুষের সাধনা। "ব্যক্তিগত সংস্কার ছাড়িয়া যাবে তার জিজ্ঞাসা, তবেই বিশ্বগত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে তার বিজ্ঞান। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জড়প্রথা গত অভ্যাস কাটিয়ে যাবে তার প্রয়াস, তবেই বিশ্বগত কর্মের দ্বারা সে হবে বিশ্বকর্মা। অহংকারকে ভোগাসক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা।"

এইরূপে দেখি, বেদান্তের আত্মবাদকে রবীন্দ্রনাথ লৌকিক জীবনের ভূমিকায় এমন অর্থ দিয়াছেন, যে, আত্মা হইল মানুষের মধ্যে সেই সত্তা, যাহা মানুষকে সকলের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়, যাহা বিশ্বগত জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের মধ্য দিয়া মানুষকে তাহার শ্রেষ্ঠতার দিকে লইয়া যায়। এই

আত্মগত সত্য রহস্যময়। মানুষ তাহার বিভিন্ন প্রকাশের মধ্য দিয়া এই আত্মার লক্ষণকে স্বীকার করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু কোনদিন মানুষ চরম করিয়া বলিতে পারিল না, এইখানেই শেষ হইল। মানুষের এই সত্য সীমার অতীতে, আমাদের কাছে তাহা সহজে প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু তাই বলিয়া এই সত্য একটা তত্ত্বমাত্র নয় বা অমানবিক কোন সত্তা নয়। মানুষ আপনার মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করিয়াই আপনার দেবত্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই দেবতা মানবিক ব্রহ্ম, তাঁহার জগৎ মানবিক জগৎ

মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই যে ধারণা, ইহারই উপর তাঁহার জীবনদেবতাবোধ প্রতিষ্ঠিত। আপন সত্তার পরিচয়ে মানুষের ভাষায় দুইটি নাম আছে। একটি অহং, আর একটি আত্মা। আত্মা বলিতে রবীন্দ্রনাথ যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এই আত্মা অহংকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়। অহং যেখানে আত্মাকে প্রকাশ করে, অহং সেখানে সত্য, আর অহং যেখানে আত্মার প্রকাশকে রুদ্ধ করে, অহং সেখানে মিথ্যা। কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার মধ্যে এমন একজন কে রহিয়াছেন, যিনি কবির অহংয়ের প্রদীপে আত্মার শিখাটি জ্বালাইয়া কবিকে অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে, ব্যক্তিজীবন হইতে বিশ্বজীবনের দিকে লইয়া যাইতেছেন। কবি তাঁহার অহংময় জীবনে যখনই বদ্ধ হইয়া যাইতেছেন, তখনই কবির জীবনদেবতা কবির মধ্যে আত্মার আলোক জ্বালাইয়া কবিকে উর্দ্ধে তুলিয়া লইতেছেন! "আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বাবে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন, তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন।"

বস্তুতঃ যদি সকলকে মিলাইয়া এক অখণ্ড মানবিক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে আমরা আমাদের জ্ঞানে কর্মে, প্রেমে আমাদের ব্যক্তিজীবনের উর্ধ্বে যতখানি সেই বিশ্বগত জীবনকে প্রকাশ করি, আমরা ততখানি নিজেদের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার এই অহংময় জীবনের মধ্য দিয়া বিশ্বজীবনের প্রকাশে তাঁহার জীবনদেবতা সেই মহিমা প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। কবি তাঁহার স্বার্থময় অহং বোধ দিয়া তাঁহার জীবনকে যথাযথভাবে তৈয়ারী করিতে পারিতেছেন না বা যেভাবে তৈয়ারী করিতেছেন তাহা যেন যথার্থ হইতেছে না। তাঁহার জীবনের সমগ্রতা, সার্থকতাকে কবি

নিজে ধরিতে পারিতেছেন না। কিন্তু কবির জীবনদেবতা যেন অশেষ যত্নে কবিকে গড়িয়া তুলিতেছেন। কবি আপনার খণ্ড ক্ষুদ্র প্রকাশের মধ্যে আপনার অখণ্ড সত্তাটিকে ধরিতে পারিতেছেন না অথচ এই খণ্ড প্রকাশের মধ্যে এমন কতকগুলি ভাব প্রকাশ পাইতেছে যেগুলি একটি অখণ্ড ভাবের পরিচায়ক ইহাদিগকে কবি চিনিতে পারিতেছেন না কারণ তাঁহার খণ্ড প্রকাশগুলি "যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজনকে রচনাকারী আছেন যাঁহার সমুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।"

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—"এই যে কবি যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবনদেবতা নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র, বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন।……আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনীশক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান, তাৎপর্য দান করিতেছে আমার রূপরূপান্তর জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই জীবন-দেবতা নাম দিয়াছি।"

এখন বুঝিতে পারি সোঽহম্ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা বোধে কিরূপে সন্নিবেশিত হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা, ইনিই তিনি, শুধু ইনি স্বার্থময়, অহংময়, পৃথিবীর নানা ঘাতপ্রতিঘাতে খণ্ডিত এবং বিক্ষিপ্ত; আর তিনি এ সকলের উর্ধ্বে এক শ্রেষ্ঠতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রত্যক্ষ নহেন, তিনি কি, কবি তাহা জানেন না, কিন্তু তিনি সৎ— তিনি আছেন। কবি আপনার বিচিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়া তাঁহাকে প্রকাশ করিতেছেন;—অন্যরূপে বলা যায়, তিনিই আপনার মতন করিয়া কবিকে নানা অনুকূলতা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। তাঁহাকে কবি অস্বীকার করিতে পারেন না, কবির কাছে তিনি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। তাঁহাকে অস্বীকার করিলে কবির কোন তাৎপর্য থাকে না। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মানবমন লইয়া মানবতার আদর্শ অনুযায়ী তাঁহার জীবনদেবতাকে সন্ধান

করিতেছেন। তাই তাঁহার জীবনদেবতা মানবিক, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে এই জীবনের মধ্যেই তাঁহাকে সন্ধান করিতে হইবে। জীবনকে অস্বীকার করিয়া এক অলৌকিক রাজ্যে অলৌকিক মনের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিবার কোন অর্থ নাই।

এখন এই জীবনদেবতা বোধের পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তির অর্থও পরিস্ফুট হইবে। রবীন্দ্রনাথ কেন যে বৈদান্তিক মুক্তিকে স্বীকার করেন নাই, তাহা এখন বুঝিতে পারিব। বৈদান্তিকের দেবতা মানবলোকের উর্দ্ধে এক অলৌকিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শের কথা বলেন তাহাকে লাভ করিতে হইলে মানুষকে তাহার অহংময় সংকীর্ণ জীবন হইতে মুক্ত হইয়া আসিতে হইবে। কিন্তু এই মুক্তি ব্যক্তি-সত্তাকে বিলুপ্ত করিয়া নয়। ইহা ব্যক্তি জীবনকে রক্ষা করিয়াই মুক্তি। কথাটি বিরোধমূলক বলিয়া মনে হয়, কারণ বন্ধনের মধ্যে কিরূপে মুক্তি আসিবে তাহা বুঝিয়া ওঠা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এমন মুক্তির কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে যে মুক্তির কথা প্রচার হইয়া থাকে সে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ইহাকে দেখিতে যাইলে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটিকে fallacious বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু আমরা বাহির হইতে ইহাতে বিরোধ দেখি মাত্র; রবীন্দ্রনাথ যে মানসিকতায় এই মুক্তির কথা বলিয়াছেন সেখানে কোন বিরোধ নাই। সেখানে ইহার সুসমঞ্জস অর্থ লক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেন,—"প্রেমের শতদল পদ্ম অহংকারের বৃন্ত আশ্রয় করে আত্ম হতে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ হতে দেশে, দেশ হতে মানবে, মানব হতে বিশ্বাত্মায় ও বিশ্বাত্মা হতে পরমাত্মায় একটি একটি করে পাপড়ি খুলে দিয়ে বিকাশের লীলা সমাধান করছে।" অহংয়ের স্বভাবই এই যে, সে ব্যক্তিগত ভোগের মধ্যে সব কিছুকে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। ইহাতে ক্ষতি হয় এই যে, আমরা আমাদের চারিপাশের দিগন্তরেখাকে ক্রমশঃ সংকীর্ণ করিয়া আনি এবং বিশ্বজীবন হইতে আমাদিগকে পৃথক করিয়া ফেলি। ইহাতে আমাদের মহিমা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং আমাদের অন্তরে যে দেবতা সেই মহিমার আদর্শরূপে বিরাজ করেন, তিনি আমাদের মধ্য দিয়া আপনাকে

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। আমাদের অন্তরের দেবতার প্রতিষ্ঠার জন্যই আমাদিগকে বৃহৎ হইতে হইবে। প্রেমের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বার্থময় জীবনের ক্ষুদ্রতাকে সঙ্কীর্ণতাকে দূর করিয়া সেখানে বৃহতের আসন স্থাপন করিতে হইবে। ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই বৃহতের আসন পাতিবার সুযোগ রহিয়াছে, ব্যক্তিসত্তা রক্ষা করিয়াই আমরা বিশ্বসত্তাকে অনুভব করিতে পারিব। অহং বিকশিত হইলে ইহা সম্ভব হয়। অহং যখন সংকীর্ণ ভোগের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যায়, তখন আর তাহার বিকাশ হয় না, কিন্তু অহং যখন নিত্য নূতন আস্বাদনের মধ্য দিয়া বিস্তৃত হইয়া যায়, তখন তাহা বিকশিত হইয়া উঠে। আসক্তি হইতে মুক্তি সম্বন্ধে শান্তিনিকেতনের একটি বাণীতে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়ে আবদ্ধ-করে—চিত্ত যখন সেই বিষয়ের ভিতরে বিষয়াতীত সত্যকে লাভ করে তখন প্রজাপতি যেমন গুটি কেটে বের হয় তেমনি সে বৈরাগ্য দ্বারা আসক্তি বন্ধন ছিন্ন ক'রে ফেলে—আসক্তি ছিন্ন হয়ে গেলেই পুর্ণ সুন্দর প্রেম আনন্দ-রূপে সর্বত্র প্রকাশ পায়।"

এই বিকাশ ভোগের মধ্যেই বিকাশ, কিন্তু ইহা বৃহত্তর জীবন ভোগের বিষয়। মুক্তি অর্থে রবীন্দ্রনাথ অহংময় ক্ষুদ্র জীবন হইতে আত্মময় বৃহৎ জীবনের মধ্যে মুক্তি বুঝিয়াছেন। তিনি জীবনের মধ্যেই জীবনের মুক্তি দেখিয়াছেন, বৈদান্তিকের মত জীবনের বাহিরে জীবনের মুক্তিকে চরম করিয়া দেখেন নাই। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ বৃহৎ জীবনের বন্ধনকে স্বীকার করিয়াছেন। এই পৃথিবীতে মানুষে মানুষে জ্ঞানে, কর্মে, ভাবে আবদ্ধ। সেই বন্ধনকে রক্ষা করিয়াই মানুষ যুগে যুগে আপনার মহিমাকে প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। চরম বৈরাগ্যের দ্বারা সে মহিমাকে ছিন্ন করিবার, সেই মহিমাকে তুচ্ছ করিবার কোন অর্থ নাই। রবীন্দ্রনাথের মুক্তি তাই এই বন্ধন-মুক্তি নয়। যে বন্ধনে আমরা বিশ্বগত ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন থাকি সেই বন্ধন হইতে মুক্তিই রবীন্দ্রনাথের মুক্তি। ইহা ব্যক্তিগত বন্ধন হইতে বিশ্বগত বন্ধনের মধ্যে মুক্তি।

এইরূপে দেখি, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা মানবিক, রবিন্দ্রনাথের, মুক্তি বৃহত্তর বন্ধনের মধ্যে মুক্তি, রবীন্দ্রনাথের স্বর্গ বস্তুলোকের মধ্যেই এক বৃহত্তর বাস্তব জগৎ। মানবসত্য প্রবন্ধে জীবনের এই বিশিষ্ট উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন—"এক সময় বসে বসে প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে ঐ আত্মবিলয়ের

ভাবেই ধ্যান করেছিলুম। পাপ্সাবার ইচ্ছে করেছি, শান্তি পাইনি তা নয়, বিক্ষোভের থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। এভাবে দুঃখের সময় সান্ত্বনা পেয়েছি, প্রলোভনের হাত থেকে এমনিভাবে উদ্ধার পেয়েছি। আবার এমন একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার করলুম, সবকে গ্রহণ করলুম। দেখলুম মানব নাট্যমঞ্চের যে-লীলা, তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই যে দেখা, একে ছোটো বলব না। এও সত্য। জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক ক'রে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।”

( ৩ )

পূর্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রসাহিত্যে জীবনদেবতা বোধের প্রকাশ আলোচনা করিতে গিয়া এই কথাটি সর্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার জীবন-দেবতাকে কবি সোজাসুজি জ্ঞানের মধ্যে আয়ত্ত করেন নাই, পরন্তু জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইতে জীবনদেবতাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই বিভিন্ন রসরচনার মধ্য দিয়া ভাবটি ধীরে ধীরে আপনাকে বিকশিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে তাঁহার মনোবিকাশটি অনুসরণ করিলে আমরা বিষয়টি বুঝিতে পারিব।

কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের সূচনাতেই মনোভাবের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রেম-প্রবণতা। 'কবি-কাহিনী' হইতে 'সন্ধ্যাসংগীত' পর্যন্ত এই ভাবটি কবির অন্তরে কেবলই ফেনায়িত হইয়াছে। 'প্রভাত সংগীতে' তাহার একটি নির্গমন দেখি এবং 'ছবি ও গানে' তাহাকে রূপের মধ্যে প্রথম আশ্রিত দেখি। ইহার পর 'কড়ি ও কোমলে' দেখি কবির চিত্ত বহির্বিশ্বকে অতি সহজে আশ্রয় করিয়াছে এবং রূপের মধ্যে ভাবকে আরোপ করিয়া কবি মনের আনন্দে কবিতা রচনা করিয়াছেন। এখানে কবিতার বিষয়বস্তু লক্ষ্য করিলে ভাব-প্রকৃতি বুঝা যাইবে। সহজ প্রীতি, কামনা বাসনার মধ্য দিয়া যাহা অতি সহজে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে আবেদন জানাইতে পারিতেছে, ভাবুক চিত্ত তাহাই গ্রহণ করিতেছে, তাহাতেই তৃপ্ত হইতেছে। মনোভাব এখানে ব্যাপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে না, নির্দিষ্টকে বেষ্টন করিয়া পরিতৃপ্তি পাইতেছে।

ইহার পর 'মানসীর' যুগে কবির মনোভাব যখন ধীরে ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে চাহিল, তখন দেখা গেল যে-রূপবস্তুকে

কবি-চিত্ত একদা আশ্রয় করিয়াছিল, আজ তাহাকে সে ভীষণভাবে নাড়া দিতেছে, আঘাত করিতেছে এবং আধারটিকে পরিপূর্ণ করিয়া উপছাইয়া পড়িতেছে। এজন্য একদা কবি যেখানে শান্ত ও তৃপ্ত ছিলেন, এখন সেখানে নানা মান-অভিমান, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা জাগিয়া উঠিয়া কবিকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। মানসীর প্রণয়মূলক ও স্বপ্নমূলক কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিলে কবির তৎকালীন মানসিকতা হৃদয়ঙ্গম হয়।

বাসনা কামনাময় প্রেমের যে অংশটি ব্যক্তিগত কবি তাহাকেই প্রণয় বলিয়াছেন। এই ব্যক্তিগত প্রণয়ে হাসিগানের উপরে যে বিক্ষোভ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারি যে, কবির চেতনায় এক গভীর মানসিক তৃষ্ণা রহিয়াছে এবং সেই তৃষ্ণা রূপের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে পরিতৃপ্ত হইতেছে না বলিয়া তাহা পীড়া দিতেছে এবং পীড়া পাইতেছে। ইহারই জন্য কবি আপনার স্বপ্নরাজ্যে একটি উদার ক্ষেত্রের কল্পনা করিয়া মনকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিতে চাহিতেছেন। এই স্বপ্নলোকে কবি রূপকে লৌকিক তুচ্ছতা হইতে ঊর্দ্ধে তুলিয়া একটি ভাবের সাধনায় গ্রহণ করিতেছেন। তাহাতে একদিকে লৌকিক রূপ একটি মহিমা লাভ করিয়াছে, অপরদিকে এই স্বপ্নলোক হইতে কবি জীবনকে একটি সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিবার প্রয়াস করিয়াছেন। মানসীর স্বপ্নলোকে রবীন্দ্রজীবন দর্শনের অস্ফুট আভাস দেখিতে পাই যদিও এখানে জীবনদেবতা বোধের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এখানে শুধু মানসিক বিক্ষোভ হইতে ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্রতার প্রতি সচেতনতা জাগিয়া উঠিয়াছে।

জীবন হইতে সঞ্জাত এই অভিজ্ঞতাটি বিশেষ মূল্যবান। ইহাতেই কবি 'সোনার তরী'তে ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্রতা ও বিশ্বজীবনের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন। কবি বুঝিলেন, ব্যক্তিজীবনের যে অহংময়তা, তাহা আপনার স্থূলতায় আপনি ভারাক্রান্ত, বিশ্বজীবনের পথযাত্রী সোনার তরীতে তথা বৃহতের চেতনায় তাহার স্থান নাই। সেখানে শুধু ব্যক্তিজীবনের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ ফসল যাহা বিশ্ব-জীবনে চলিতে পারে, তাহাই স্থান পায়। এখানে বিশ্বগতজীবন ও ব্যক্তি-জীবনের মাঝখানে একটা নদীর ব্যবধান দেখিলেন। 'দুই পাখী' কবিতায় ইহার তাৎপর্যটি আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

এইখানে খেয়ার নেয়ের মধ্যে জীবনদেবতা বোধের প্রথম আভাস পাই।

এই বিদেশিনীর মুর্তিতে কবির জীবনদেবতার প্রথম প্রকাশ। কিন্তু ইনিই যে কবির জীবনদেবতা তাহা কবি বুঝেন নাই। জীবনের সহিত ইঁহার নিগূঢ় সংযোগ এখনও পরিস্ফুট হয় নাই, ইঁহাকে এখনও কবির জীবন-পণ্যের উদাসীন ব্যবসায়ী বলিয়া মনে হইতেছে। যে রহস্যলোকে তাঁহার কারবার, তাহার কথাও কবি জানেন না। ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে ইনি শুধু মৌন হাস্য করেন। এই রহস্যময়ী এখন কবির জীবনের কর্ণধার। আভাসে, ইঙ্গিতে কতটুকু পরিচয়ই বা কবি পাইতেছেন, কোনদিন পূর্ণ পরিচয় পাইবেন কিনা তাহাও কবি জানেন না।

"আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ আলোক পড়িবে ঢাকা
শুধু ভাসে তব দেহ-সৌরভ
শুধু কাণে আসে জল কলরব
বায়ুভর পরে উড়ে পড়ে তব কেশের রাশি ;
অবশ হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর
কোথা আছ ওগো করহ পরশ নিকটে আসি
কহিবে না কথা দেখিতে পাব না নীরব হাসি !"

এইরূপে 'সোনার তরী'তে দেখি, যে জগতে কবির জীবনের সোনার ফসলগুলির সার্থকতা সে জগৎও কবির কাছে যেমন অস্পষ্ট, সেই জগতে এই সোনার ফসল লইয়া যে কারবার করিতেছে, তাহার পরিচয়ও তেমনি অস্পষ্ট। সোনার তরীতে যে বিরোধ ও বেদনা দেখা গিয়াছে তাহা মূলতঃ এই বোধের অস্পষ্টতার জন্য।

ইহার পরে 'চিত্রায়' আর ইহা অস্পষ্ট থাকে নাই। এখন কবির কাছে দুইটি জগৎ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—একটি রূপময় বিশ্বজগৎ এবং আর একটি ভাবময় স্বপ্নজগৎ। এই দুই জগৎ আপনাদের পার্থক্য লইয়া কবির কাছে প্রতীয়মান হইয়াছে। একটি জগতে কবি নানা দুঃখ, দৈন্য ও অভাব অভিযোগ দেখিতেছেন এবং আর একটি জগতে পরিপূর্ণতা সার্থকতা দেখিতেছেন—সেখানে সকল দৈন্য দূর হইয়াছে, সকল অভাব মিটিয়াছে। কিন্তু এই স্পষ্টতাতেও কবির বিরোধ মিটে নাই। কবি এই দুইটি পৃথক জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। অথচ ইহাদের মধ্যে

সমন্বয় সাধন করিতে পারিতেছেন না। কবি যখন তাঁহার ভাবরাজ্যে চলিয়া যাইতেছেন তখন সেই অন্তরের অন্তঃপুর হইতে সমস্ত বিশ্বজগৎ নির্বাসিত হইতেছে, আবার যখন বিশ্বজগতে ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন সেই সুখস্বর্গলোক হইতে বিদায় লইতে হইতেছে। কবি রবীন্দ্রননাথ যদি escapist হইতেন, যদি শুধুমাত্র বস্তুজগতের সকল তুচ্ছতার উর্ধ্বে উঠিয়া ভারতীয় ঋষিগণের মত আপনার ভাব সাধনায় সমাধিস্থ হইতে চাহিতেন, তবে সেই সুখ স্বর্গলোক হইতে ফিরিয়া আসিতেন না বা এই দুই বিভিন্ন জগতের মধ্যে এইভাবে সামঞ্জস্য খুঁজিতে চাহিতেন না। কিন্তু পৃথিবীর কবি ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলির প্রতি নাড়ীর টান অনুভব করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিতে ব্যাকুল হইয়াছেন।

"অয়ি দীনহীনা
অশ্রু-আঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্তভূমি, আজি বহুদিন পরে,
কাঁদিয়া উঠেছে মোর চিত্ত তোর তরে।
যেমনি বিদায়-দুঃখে শুষ্ক দুই চোখ।
অশ্রুতে পুরিল, অমনি এ স্বর্গলোক
অলস কল্পনা প্রায় কোথায় মিলালো
ছায়াচ্ছবি। তব নীলাকাশ, তব আলো,
তব জনপূর্ণ লোকালয়, সিন্ধুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীলগিরি শিরে
শুভ্র হিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়, শূন্য নদীপারে
অবনতমুখী সন্ধ্যা—বিন্দু অশ্রুজলে
যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পনের তলে
পড়েছে আসিয়া!"

এই রূপ-জগতের প্রতি কবি অকৃত্রিম আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই এখানে নামিয়া আসিয়াছেন। কবি শুধুমাত্র যেখানে যেখানে সৌন্দর্যের উৎসারণ সেখানেই আসেন নাই, যেখানে সৌন্দর্যের কোন স্ফুরণ নাই, যেখানে সকল প্রকার দীনতা, বীভৎসতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে—যেখানে, অন্ধকার কারামাঝে জর্জর বন্ধনে অনাথিনী মাগিছে সহায়,' যেখানে—

"স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া, বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার ;—"

সেই জগতের মধ্যেও কবি আসিয়াছেন। কিন্তু এই দুই জগতের মধ্যে সামঞ্জস্যের একটা ইঙ্গিত পাইলেও ইহারা কবির কাছে পৃথক হইয়া আছে ; সেই জন্য চিত্রা কাব্যে দ্বন্দ্ব রহিয়া গিয়াছে। কবি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, এই বিশ্বলোকে যাহা নানাভাবে খণ্ডিত, পীড়িত, সেখানে যদি আত্মবোধ জাগাইয়া দেওয়া যায়, আপনার শ্রেষ্ঠতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবার প্রেরণা দেওয়া যায়, তাহা হইলে হয়তো এই দুঃখ দুর হইবে, হয়তো এক প্রেমে জীবনের সর্ব্বপ্রেমতৃষা তৃপ্ত হইবে।

এই যে সংশয়ময় বিশ্বাস, ইহাতেই কবির মনে জীবনদেবতা বোধটি পরিস্ফুট হইয়াছে। পরিচয় এখনও রহস্যময়, কিন্তু 'সোনার তরী' যুগে যে অপরিচয় ছিল, তাহা এখন কাটিয়া গিয়াছে, এখন কবি জীবনদেবতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তুলিয়াছেন। যখন বিশ্বের এই রূপজগৎ এবং কবির আদর্শময় ভাবজগৎ,—এই দুই জগতের বোধ স্পষ্ট হইয়া উঠিল এবং ইহাদের সামঞ্জস্য খুঁজিতে গিয়া কবি যখন অনুভব করিলেন যে, দীনতা হইতে মহিমার মধ্যে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের মধ্যে, সঙ্কীর্ণতা হইতে ব্যাপকতার মধ্যে, আত্মবিকাশের দ্বারা মানুষের মন মুক্তিলাভ করে, তখন সেই আদর্শলোকে সকল শ্রেষ্ঠতার মধ্যে কবি তাঁহার জীবনদেবতাকে অধিষ্ঠিত দেখিলেন। 'সোনার তরী'তে কোনও এক অজ্ঞাত রহস্যময় লোকে এই বিদেশিনীর আশ্রয় রহিয়াছে বলিয়া কবি কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তাহাকে আপনার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত দেখিলেন।

কবি অনুভব করিলেন, তাঁহার অহংয়ের প্রদীপে আত্মার শিখাটি জ্বালাইয়া সেই রহস্যময়ী আপনার মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। সেই যন্ত্রী কবির হৃদয়-বীণাটিকে এমনভাবে বাঁধিয়াছেন যে তাহাতে বিশ্বসঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। রহস্যলোকে বসিয়া সেই রহস্যময়ী কবিকে বিশ্বের মানুষ করিয়া, কবির ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ মিলাইয়া এক অখণ্ড তাৎপর্যে কবিকে গড়িয়া তুলিতেছেন। এই উপলব্ধি হইতে কবির জীবনদেবতা-বোধ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—"যিনি 'আমি' নামক এই ক্ষুদ্র নৌকাটিকে সূর্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র হইতে,

লোকলোকান্তর যুগযুগান্তর হইতে একাকী কালস্রোতে বাহিয়া লইয়া আসিতেছেন, যিনি আমাকে লইয়া অনাদিকালের ঘাট হইতে অনন্তকালের ঘাটের দিকে কী মনে করিয়া চলিয়াছেন আমি জানি না, সমস্ত ভালোবাসা, সমস্ত সৌন্দর্যে আমি যাঁহাকে খণ্ডভাবে স্পর্শ করিতেছি, যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক, যিনি ব্যাপ্তভাবে সুখদুঃখ অশ্রুহাসি এবং গভীরভাবে আনন্দ, চিত্রা-গ্রন্থে আমি তাঁহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি।"

কিন্তু এই জীবনদেবতার উপলব্ধি কবিকে নির্দ্বন্দ্ব করে নাই। কারণ কবি অন্তরের অন্তঃপুরে জীবনদেবতার উপস্থিতি অনুভব করিতেছেন মাত্র—জীবনের সকল ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে একটি ভাবলোকে তাঁহার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই রূপ-জগতের মধ্যে, সীমার মধ্যে কবি তাঁহাকে ধরিতে পারিতেছেন না, অথচ কবি এই রূপজগৎ হইতে একেবারে পলায়ন করিবেন না! তাই কবি জানেন—

"যত শত ভুল করেছি এবার
সেই মতো ভুল ঘটিবে আবার
ওগো মায়াবিনী কত ভুলাবার
মন্ত্র তোমার আছে,
আবার তোমারে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে প্রান্তরে
পথ হতে পথে ঘর হতে ঘরে
দুরাশার পাছে পাছে।"

কবির মধ্যে বাস্তবানুগামিতা না থাকিলে এই দ্বন্দ্বের অবসর থাকিত না এবং এই বেদনা জাগিয়া উঠিত না। এই যে বেদনা, ইহাকে কবি অন্তরের মধ্যে নিরন্তর বহন করিয়াছেন, তবু ভালোমন্দে মেশা এই বিশ্বজগৎকে কবি কোনদিন অস্বীকার করেন নাই। এই বাস্তবমুখিতার জন্যই পরবর্তীকালে কবি তাঁহার জীবনদেবতাকে বিশ্ব-লোকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত দেখিলেন এবং বস্তুলোকের মধ্যে একটি বৃহত্তর বাস্তব কবির নয়ন সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল।

( ৪ )

চিত্রায় কবির মনে যে বেদনা, দ্বন্দ্ব জাগিয়াছিল, চিত্রার পরে চৈতালিতে আসিয়া তাহার একটা শান্তি দেখিতে পাইলাম। এই প্রশান্তি চৈতালীর সনেটগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে,—ইহা যেন কড়ি ও কোমলের যুগকে

মনে করাইয়া দেয়। কিন্তু কড়ি ও কোমলের যুগে যে মানসিক প্রশান্তি, তাহা জীবনের নবীনতাকে সহজে উপলব্ধি করিবার জন্য ; এখানের প্রশান্তি বৈচিত্র্যের মধ্যে সহজ অনাবিল আনন্দকে উপলব্ধি করিবার জন্য। এখানে সকলের সহিত কবি আপনার যোগ অনুভব করিতেছেন। চিত্রার যুগে আমরা দেখিয়াছি, কবি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে একটি ছন্দ অনুভব করিয়াছেন, তাহার বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহাকে প্রণাম জানাইয়াছেন—সেই ছন্দের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে লইয়া সকলে এবং সকলকে লইয়া তিনি, এ আনন্দময় বোধটি তখনও জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত হয় নাই। চৈতালিতে কিন্তু কবি-চিত্তে বিশ্ববোধের প্রসন্নতা দেখি।

'নৈবেদ্য'তে এই মনোভাবেরই আরও বিকাশ ঘটিয়াছে। এখানে সবকিছুর মধ্যেই কবি একটি উদ্দেশ্যকে, সার্থকতাকে পরিস্ফুট দেখিতেছেন। যে দিনটিকে নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহাকে ভিতরে ভিতরে পূর্ণতালাভ করিতে দেখিতেছেন। এখানে হেমন্তের মধ্যাহ্নে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে পূর্ণতার একটি শান্ত ক্রিয়া অনুভব করিতেছেন :—

"এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে
অনুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।"

এখন রূপজগতের মধ্যে কবি একটি ভাবের ব্যাপ্তি দেখিতেছেন, তাহার মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনা দেখিতেছেন এবং ইহাতেই রূপজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন যে ভাবজীবনে কবির জীবনদেবতার নির্জন আসন পাতা ছিল সেখান হইতে সে আসন বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাওয়ায় তিনি বিশ্বের দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। জীবনদেবতা যখন বিশ্বদেবতায় পরিণত হইলেন, যখন বিশ্বের মধ্যে তাঁহার আসন পাতা হইল, তখন ধীরে ধীরে কবির বস্তুজগতের দ্বন্দ্বটি প্রশমিত হইয়া আসিল। কবি এখন আর তাঁহার দেবতা হইতে কোথাও বিচ্ছিন্ন হইতেছেন না, রূপজগতের মধ্যে তাঁহার সহজ প্রকাশটি সহজে চোখে পড়িতেছে। জীবনের এই অভিজ্ঞতা হইতে কবি একটি মূল্যবান সত্য অনুভব করিলেন :

"তোমার অসীমে প্রাণ মণ লয়ে
যতদুরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
কোথা বিচ্ছেদ নাই।"

ইহাই উপলব্ধি করিয়া জীবনদেবতার পরিচয় কবির কাছে আরও সহজ হইয়া উঠিল।—

"না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি
অর্থের শেষ পাই না তবুও
বুঝেছি তোমার বাণী।"

এখন বিশ্বের মধ্যে কবি তাঁহার জীবনদেবতাকে উপলব্ধি করিলেন। এই সময় দেখি, ভারতের অধ্যাত্মবাদ কবিকে বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতীয় ঋষিগণের মন্ত্রে যে অমৃতের বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল কবি তাহা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বদেবতার মন্ত্রটি এখন কবির জীবনবোধের সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ কবি যখনই তাঁহার জীবনদেবতাকে বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত দেখিলেন, তখনই উপনিষদের মন্ত্রের সঙ্গে কবির হৃদয় বীণাটি একই সুরে বাজিয়া উঠিল। উপনিষদের মন্ত্রকে কবি তাঁহার জীবন-সঙ্গীতে পরিণত করিতে চাহিলেন। জীবনের মধ্যে সেই মন্ত্রের রূপায়ণটি এইরূপ ঃ

ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্মভোলা
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা—
চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখ শোক
যত ভালোমন্দ, যত গীত গন্ধ লয়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি।
দ্বার রুধি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম।"

ইহাতেই রবীন্দ্রনাথের কবি পরিচয়টি বড় হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বৈদান্তিক ঋষি হইয়া উঠেন নাই, পৃথিবীর কবি হইয়া উঠিয়াছেন। সে কবি বলেন ঃ—

বিচিত্র ভাষায়
তোমার সংসার মোরে কাঁদায় হাসায় ;
তব নরনারী সবে দিগ্বিদিকে মোরে
টেনে নিয়ে যায় কত বেদনার ডোরে,
বাসনার টানে। সেই মোর মুগ্ধ মন
বীণাসম তব অঙ্কে করিনু অর্পণ—
তার শত মোহতন্ত্রে করিয়া আঘাত
বিচিত্র সংগীত তব জাগাও, হে নাথ।"

চিত্রার যুগে রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতার সঙ্গীত-লীলায় পীড়ন অনুভব করিতেছিলেন—তাঁহার অঙ্গুলি স্পর্শকে কঠোর আঘাত বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু এখন কবি আপনার হৃদয়বীণাকে অতি সহজে জীবনদেবতার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন।

এইরূপে 'নৈবেদ্য'তে কবি জীবনদেবতাকে বিশ্বদেবতা বলিয়া উপলব্ধি করিলেন। খেয়ায় তাঁহার ধ্যানে বৃহত্তর জীবনে উত্তরণের আনন্দ অনুভব করিলেন, এবং গীতাঞ্জলিতে ইহা সকল প্রশ্ন সংশয়ের অতীত হইয়া সংগীতের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া গেল। এখন আর মূল সত্যে কোন বিরোধ রহিল না। কবি আপনার জীবনদেবতাকে জানিলেন এবং তাঁহার সহিত আপনার সম্বন্ধ বুঝিলেন। এখন কবি জীবনের সকল বিক্ষুব্ধতার উপরে একটি সহজ প্রশান্তি রক্ষা করিয়া মুক্ত আকাশের তলায় তাঁহার প্রণাম নিবেদন করিলেন। ইহা গীতিপ্রণাম—গানের অঞ্জলি। এই গানের উৎস অনুসন্ধান করিতে আর বিলম্ব হয় না। যখন আমাদের চিত্ত বিরোধমুক্ত হয়, যখন কোন ভয় সংশয়ে আর আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না তখনই স্বাভাবিক ভাবে গানের স্ফুরণ হয়। এই গানে পাওয়ার আনন্দ আছে, না পাওয়ার বেদনাও আছে। জীবনের পাওয়া-না-পাওয়ার দ্বন্দ্বটি কবিকে সংগীতের মধ্যে মুক্তি দিয়াছে।

———

# তৃতীয় অধ্যায়

## রূপলোক ও ভাবজীবন

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা এবং সেই প্রেমের ধ্যানমূর্ত্তির সহিত আমরা পরিচিত হইলাম, এখন সেই প্রেমের আলোকে বহির্জগত ও অন্তর্জগতের কি স্বরূপ কবির নিকট প্রকাশ পাইল তাহাই আমাদের জিজ্ঞাসার বিষয়।

আমাদের জীবনে সত্যের সহিত পরিচয় দুই প্রকারে হইয়া থাকে। এক হইল, রূপের মধ্যে যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করি তাহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বস্তুজগতের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারা নিয়ত স্পর্শ করিয়া আমাদিগকে তৎপ্রতি সচেতন করিয়া রাখে। সে সত্যকে ভুলিয়া থাকিবার জো নাই, তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত প্রত্যক্ষগোচর। এই যে রূপ-সত্য, তাহার সহিত আমাদের পরিচয় সহজ ও ঘনিষ্ঠ। জীবনের প্রারম্ভেই তাহার সহিত আমাদের পরিচয় সুরু এবং তাহার সহিত সুষ্ঠু ব্যবহারে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত।

আর একটি সত্য আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত করে; তাহা হইল ভাব-সত্য। এই সত্যের স্থান আমাদের মনে, তাহার স্বীকৃতি আমাদের উপলব্ধিতে। রূপ-সত্যকে যেমন আমরা বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূলভাবে স্পর্শ করি, এই ভাব-সত্যকেও তেমনি আমাদের বিভিন্ন, বিচিত্র অনুভূতিগুলির দ্বারা আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করিয়া যাই। তাহাকে আমরা আমাদের মনের মধ্যে আমাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া অনুভব করি, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া কোনমতে উড়াইয়া দিতে পারি

না। অথচ তাহা রূপ নয়, তাহা ভাব মাত্র, তাহাকে হাতে ধরিয়া রূপজগতে হাজির করিবার উপায় নাই, তাহা মনের দ্বারাই উপলভ্য। রূপ সত্য যেমন বাস্তবিক ও বৈজ্ঞানিক, ভাব-সত্য তেমনি মানসিক ও আধ্যাত্মিক।

আমাদের ভাব-সত্য রূপজগতের সহিত আমাদের ব্যবহারকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। এই ভাবলোকের সত্যকে আশ্রয় করিয়া ঘিরিয়া থাকে আমাদের আদর্শ, আমাদের আশা-ভরসা, আমাদের সাধনা। রূপ-সত্য আমাদের জীবনকে সীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করে, ভাব-সত্য আমাদের জীবনকে অসীমের দিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়। রূপলোক ও ভাবলোক লইয়া আমাদের জীবন সংহত ও বিস্তৃত। ইহাদের কোন একটিকে অস্বীকার করিলে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়। যদি ভাবলোককে আমরা রূপলোক হইতে বিবিক্ত করিয়া দেখি তবে জীবনের সহিত তাহার যোগ দুর্বল হইয়া যায়, তবে সেখানকার সত্যকে আমরা সন্দেহ করিতে থাকি, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি না। 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "বাইরের জগতে মানুষের যে পরিচয় সেইটেতেই তার প্রতিষ্ঠা। বাইরের এই পরিচয়টি যদি ভিতরের সত্যের সঙ্গে কোন অংশে না মেলে তা হলে তার অস্তিত্বের মধ্যে একটা আত্মবিচ্ছেদ ঘটে।" অর্থাৎ, বাহির এবং ভিতর এই উভয়ের পরস্পরের যোগ না থাকিলে কোন একটি সত্য পরিপূর্ণ মর্যাদা পায় না। বাহিরের দিকটিকে অস্বীকার করিয়া আত্মগত ভাবসাধনার মধ্যে সত্যকে ধরিতে চাহেন এরূপ escapist-এর সংখ্যা আমাদের দেশে বিরল নয়। বস্তুতঃ ভাবকে রূপের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া দেখা একটি শিল্পী-দৃষ্টি। এই শিল্প কর্ম্মটি খুব সহজ নয়। কত বিচিত্রতা সম্পাদন করিয়া আমাদের জীবন এই রূপ জগতে বিস্তৃত; আমাদের ভাব-সত্যটি এই বৈচিত্র্যের সংস্পর্শে আসিয়া নানা বিরোধের সম্মুখীন হয়। তাঁহারাই জীবন-শিল্পী শত দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্যেও যাঁহাদের জীবনের প্রকাশটি তাঁহাদের জীবন-সত্যকে অবিকৃত ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রূপায়িত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এমনই এক জীবন-শিল্পী। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-জীবনদর্শন সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করিলে আমরা এই জীবন-শিল্পীর শিল্প-প্রকাশ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের নিগূঢ় তাৎপর্য বুঝিতে পারিব। ইহা গভীর ও বিশদ আলোচনা-সাপেক্ষ। চিত্রা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় তাঁহার ভাবলোক ও রূপলোক সর্বপ্রথম স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

চিত্রে কাব্যের একটি অখ্যাত কবিতা লইয়াই আলোচনা সুরু করি। আমি 'সুখ' কবিতাটির কথা বলিতেছি। এখানে কবির রূপলোকের বিশিষ্ট পরিচয় পাই। এখানে, বলাই বাহুল্য, রূপলোকের নূতন তাৎপর্যটি কবির কাছে অভিব্যক্ত হইয়াছে। মেঘমুক্ত প্রসন্ন আকাশের তলায় কবি দৈনন্দিন পৃথিবীর ছবিটি দেখিতেছেন এবং অন্তরের মধ্যে একটি অনাবিল শান্তি অনুভব করিতেছেন। এখানে রূপবস্তু সাধারণ ও সামান্য। অর্ধমগ্ন বালুচর, ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু, প্রচ্ছন্ন কুটির, বক্রশীর্ণ গ্রাম্যপথ, কৌতুকালাপে মগ্ন স্নানরত গ্রামবধূগণ, নৌকার উপর কর্ম্মনিরত জেলে ও তাহার উলঙ্গ বালক, আতপ্ত পবনে সঞ্চারিত আম্রমুকুলের গন্ধ ও বিহঙ্গমের মধুর স্বর,—এ সকলি একটি শান্ত ছন্দ রক্ষা করিয়া কবি-চিত্তে গভীর ও সহজ ভাবের আবেদন জানাইতেছে। ইহা যেন বিশ্ববীণা হইতে গানের মতন উঠিয়া সমস্ত গগন নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহাকে প্রকাশ করিতে কবি উৎসুক হইয়াছেন। কিন্তু ইহাকে ধরা তো সহজ সাধ্য নয়। এই রূপকে যখনই আঁকড়াইয়া ধরিতে যাইতেছেন, বাসনার মধ্যে, ভোগের মধ্যে যখনই তাহাকে আবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন, তখনই তাহার মধ্যে সুন্দরের ব্যঞ্জনা অন্তর্হিত হইতেছে। তাই কবি এখানে মানসীর যুগের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়াছেন:

কঠিন আগ্রভরে
ধরি তারে প্রাণপণে মুঠির ভিতরে
টুটি যায়, হেরি তারে তীব্রগতি ধাই
অন্ধবেগে বহুদূরে লঙ্ঘি চলি যাই
আর তার না পাই উদ্দেশ।

ইহারই জন্য মহাবিশ্ব-সঙ্গীতটিকে কবি সহজে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। এই অপ্রকাশের বেদনা কবির কাব্যজীবনে বরাবর রহিয়া গিয়াছে। চিত্রায় রূপলোকের মধ্যেই এই বিশ্ব-সঙ্গীতটিকে, এই শান্ত সরল ছন্দটিকে তিনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন এবং তাহার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাইয়াছেন। 'বিজয়িনী' কবিতাটিতে সমগ্র বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্যের কেন্দ্রীভূত সত্তার কাছে অনঙ্গ-দেবতার অনুরূপ একটি প্রণাম দেখি। সৌন্দর্যসত্তাকে অনঙ্গদেবতা ভোগের মধ্যে বাঁধিতে পারেন নাই, তাহাকে প্রণাম জানাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

চিত্রায় রূপলোকের মধ্যে এই সহজ সরল ছন্দের আবিষ্কারটি অভিনব। ইহাতে কবি রূপলোকের মধ্যে একটি মহিমা দেখিতেছেন, একটি গভীরতা ও ব্যাপ্তি দেখিতেছেন। এখন তিনি পূর্ণিমার আলোতে একটি লোক-লোকান্তর-পূর্ণ অনন্ত মৌনের ব্যঞ্জনা আস্বাদ করিতেছেন, ধূলির মধ্যে ব্রতচারিণী মাতৃমূর্তির মহিমাধ্যানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছেন।

গৈরিকবসনে,<br>
হে ব্রতচারিণী তুমি সাজি উদাসীনা<br>
বিশ্বজনে পালিতেছে আপন ভবনে।<br>
নূতনেরে নির্বিচারে কোলে লহ তুলি,<br>
পুরাতনে বক্ষে ধর, হে জননী ধূলি॥

এইরূপে যাহা আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, কবি-দৃষ্টিতে তাহা মহিমা লাভ করিতেছে। রূপলোকে যাহা অসম্পূর্ণ, সহস্র আঘাতে চূর্ণ, বিদীর্ণ, বিকৃত, মৃত্যুর দ্বারা নানা ভাবে খণ্ডিত, কবি মৃত্যুর পরপারে তাহারও একটি সম্পূর্ণতা, সফলতার সম্ভাবনা আশা করিতেছেন ঃ

হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময়<br>
অনিত্য চঞ্চল<br>
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব নূতন রূপে<br>
হয় সে সফল।<br>
চিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব<br>
রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,—<br>
জন্মান্তের নবপ্রাতে সে হয়তো আপনাতে<br>
পেয়েছে উত্তর॥

এই রূপলোক অনিত্য, চঞ্চল, বিফলতাময়; কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন জলস্থল, নভস্তল মৌন, স্তম্ভিত, বিষাদে নিমগ্ন, তখন সেই ধূসর সন্ধ্যায় পৃথিবীর দিকে চাহিয়া কবি তাঁহার জীবন-যাত্রাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন। কবির মনে হইতেছে, ধরিত্রী যেন আপনার মধ্যে একটী পরি-স্ফুটনোন্মুখ জীবনকে ধারণ করিয়া আছে; নীহারিকা হইতে তাহার সুরু এবং লক্ষ কোটি জীব বক্ষে ধারণ ও লালন করিয়া বহু দুঃক্ষ-ক্ষতির মধ্য দিয়া আজ তাহার বর্তমান পরিণতি। এই জীবধাত্রী জননীর কাজ এখনও শেষ হইয়া

যায় নাই, সে ভবিষ্যতের ঘোর তমসার দিকে চাহিয়া আপনার শেষ সার্থকতা খুঁজিতেছে ঃ

ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার
গাঢ়তর নীরবতা—বিশ্বপরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন, ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্যপানে—"আরো কোথা! আরো কতদুর।"

এইরূপে রূপলোককে কবি সামগ্রিক ভাবে দেখিতেছেন এবং ইহাতে এক দিকে যেমন সেখানে একটা সহজ শ্রী ও সার্থকতা দেখিতে পাইতেছেন, অপর দিকে তেমনি একটি বৃহত্তর পটভূমিকায় জীবনকে অবলোকন করিয়া জীবনের মহত্তর ধর্মগুলি এবং জীবনের দীনতা উভয়ই অনুভব করিতেছেন। 'ব্রাহ্মণ' এবং 'পুরাতন ভৃত্য' কাহিনী দুইটিতে জীবনের সত্য-ধর্ম ও প্রেম-ধর্মের মহান্ রূপ দেখাইয়াছেন, আবার 'দুই বিঘা জমি'তে উৎপীড়কের হীন অত্যাচারের ছবি স্পষ্ট করিয়া আঁকিয়াছেন। 'নগর-সংগীত' এবং 'শীতে ও বসন্তে' কবিতায় আমাদের প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ জীবনকে কবি বিদ্রূপ করিয়াছেন। রূপলোকের মধ্যে কবি যে ব্যাপ্তি, যে শ্রীটুকু দেখিতেছেন আমাদের নাগরিক জীবনের তুচ্ছতা ও সঙ্কীর্ণতা তাহার অনেকখানি ব্যাহত করিতেছে। ইহাতে কবিচিত্তে বিরোধ জাগিয়াছে এবং তাহা কবিকে কোনো কোন ক্ষেত্রে স্যাটা-য়ারিষ্ট করিয়াছে। কিন্তু চিত্রা কাব্যে রূপজগতের সহিত ব্যবহারে শ্লেষের সুর মুখ্য হইয়া উঠে নাই, কারণ কবির অন্তর্লোকে বৃহতের, পূর্ণতার ও মহিমার ভূমিকা রহিয়াছে এবং তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে কবি যাহা তুচ্ছ, যাহা দীন তাহাকে শোধন করিয়া লইতে চাহিতেছেন, তাহার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য, একটা সার্থকতা দেখিতে চাহিতেছেন।

এই ভাবলোকে কবি এক অভিনব উচ্চতর মানসিক ভোগের সন্ধান করিতেছেন, সেখানে এক সম্পূর্ণতাকে ধরিতে চাহিতেছেন। তাহা এই রূপলোকের পরপারে রহিয়াছে। রূপলোকে কবি তাহাকে ধরিতে পারিতেছেন না, কিন্তু রূপ হইতেই সেই অরূপের তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিতেছে। পূর্ণিমা রাত্রে যখন চতুর্দিক শুভ্র জ্যোৎস্নায় আবেশবিহ্বল, তখন সেই রূপলোকের মধ্যে থাকিয়া কবির চিত্ত অরূপ-সৌন্দর্যের তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছে ঃ

আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায় আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি রাত্রিদিন,
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তর মন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি—বাসনার তীরে
একা বসে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে নাহি তার সীমা!

অনন্ত আকাশ হইতে চন্দ্রালোক আসিয়া কবিকে স্পর্শ করিতেছে, তাঁহাকে তৃষ্ণায় ব্যাকুল করিতেছে, কবি সেই রূপের পর্দ্দা সরাইয়া তাহারই পরপারে রূপাতীতকে ধরিতে চাহিতেছেন ঃ

কোনো মর্ত দেখে নাই
যে দিব্যমূরতি আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।

কবি অনুভব করিতেছেন, রূপের পরপারে রহস্যময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মী রহিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে এই রূপস্রোত ভাসিয়া আসিতেছে এবং কবির চেতনাকে স্পর্শ করিয়া কবিকে সেই অভিনবার উদ্দেশ্যে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে, কবির অন্তরে অপূর্ব্ব বিরহ জাগাইয়া তুলিতেছে। কবি ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন ঃ

খোলো দ্বার, খোলো দ্বার।
তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার
সৌন্দর্যসভায়। নন্দনবনের মাঝে
নির্জন মন্দিরখানি, সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা—রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ীবালা;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা॥

'সোনার তরী'তে ভাবলোকে এই অরূপ-ধ্যান অস্পষ্ট ছিল। সেখানে কবি স্বপ্নের মধ্য দিয়া ঘুমের দেশে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর গলায় মালা পরাইয়াছিলেন। এখানে রূপ-প্রবাহ বাহিয়া রূপের পরপারে অরূপমূর্তির গলায় মালা দিতে চলিয়াছেন। এখানে কবি সচেতন, কবির ভাবলোক শুধুমাত্র স্বপ্ন দিয়া

তৈয়ারি নয়, একটা নিদারুণ তৃষ্ণা, একটা গভীর বিরহ-বেদনা কবিকে ভাবলোকে উন্নীত করিয়াছে। সৌন্দর্য-সত্তার জন্য এই যে অনন্ত বাসনা ও বিরহানুভূতি, 'উর্বশী' কবিতায় ইহার তত্ত্বটি প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মানসস্বর্গে এই সৌন্দর্যসত্তা মূর্তিমতী, তাহার জন্য আমাদের বাসনা সর্বদা জাগ্রত ঃ

অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনী।

এই যে গভীর তৃষ্ণা কবিকে অভিনবার ধ্যানে সমাহিত করিতেছে, 'মরীচিকা' কবিতাটিতে সেই তৃষ্ণার্ত কবির উক্তি ঃ

আমি যে তৃষিত তোমা চেয়ে।
আমি চিরদিন থাকি এ মরুশয়ানে
সঙ্গীহারা। এ তো নহে পিপাসার জল,
এ তো নহে নিকুঞ্জের ছায়া, পক্কফল
মধুরসে ভরা ;···

এই ভাবলোকে কবি যাহা অনুভব করিতেছেন তাহা অর্থহীন শূন্যতা নহে, কবির কাছে তাহা একান্ত সত্য। এ সত্য বস্তুগত নহে, ইহা আত্মিক ; তাই ইহাকে কবি বাহিরের রূপলোকের মধ্যে উপস্থিত করিয়া প্রমাণ করিতে পারেন না, শুধু আপনার মধ্যে ইহার সত্যতা অনুভব করেন। 'প্রেমের অভিষেক' কবিতায় এমনই এক ভাব-সত্যের উপলব্ধির কথা কবি বলিয়াছেন। তিনি আপনার অন্তরে প্রেমের মহিমা অনুভব করিতেছেন এবং ইহাতেই প্রেমের সত্যতায় আস্থাবান হইয়াছেন। রূপলোকে কবি যে দৈন্য অনুভব করিতেছিলেন, এখন প্রেমের উপলব্ধিতে সে দৈন্য দূর হইয়া গিয়াছে। বলিয়াছেন ঃ অপূর্ণ হইয়াও প্রেমের জগতে তিনি পূর্ণ ঃ

···সেথা আমি জ্যোতিষ্মান্
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী।

এই যে নূতন রস-সম্পদে কবির ভাবলোক ভরিয়া উঠিয়াছে, যাহার মহিমা কবি আপনার মধ্যে নিয়ত অনুভব করিতেছেন, তাহাতেই কবির আত্মোপলব্ধি

সুরু হইয়াছে; আপনার মধ্যে কবি একটি ভাব-সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছেন এবং তাহার প্রকাশটি বুঝিতে পারিতেছেন। এই প্রকাশকে কবি আপনার মধ্যে একটা উৎসব বলিয়া মনে করিয়াছেনঃ

ওগো যে তুমি আমার মাঝে নূতন নবীন
সদা আছ নিশিদিন
তুমি কি বসেছ আজি নববরবেশে সাজি
কুন্তলে কুসুমরাজি অঙ্কে লয়ে বীণ।
ভরিয়া আরতি থালা জ্বালায়েছ দীপমালা
নূতন নবীন,
আজি বসন্তের দিন॥

কিন্তু এই উপলব্ধির সময় কবিকে রূপলোক ছাড়িয়া ভাবলোকের মধ্যে আসিতে হইতেছে। তখনঃ

সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে।

ইহাতে এই দুই বিভিন্ন জগৎ তাহাদের বিশিষ্টতা লইয়া কবির কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যকার বিরোধটি সম্বন্ধে কবি সচেতন হইয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছেনঃ

আজি এ উৎসব কলরব কেহ নাহি জানে,
শুধু আছে তাহা প্রাণে।

এই ভাবলোক কবির আত্মবোধের ভূমি। অহং-এর ক্ষুদ্র খণ্ড, সীমাবদ্ধ প্রকাশ হইতে দূরে এখানে একটি অখণ্ড ভাবসত্তার উপলব্ধি। 'অন্তর্যামী' কবিতাটিতে কবি এই ভাবসত্তার রহস্য খুঁজিয়া জীবনের সহিত তাহার সংযোগটি দেখাইতে চাহিয়াছেন এবং তাহার তত্ত্ব ও তাৎপর্য নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এখানে কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার একটি সংশয়ময় জীবন-দর্শন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। চিত্রা কাব্যে এই জীবন-দর্শনটি শুধুমাত্র রস-চেতনায় আস্বাদিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগে 'মানুষের ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতনে'র বাণীগুলিতে ইহা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কবি বলেন, রূপলোকের সহিত তাঁহার যে কারবার, সেখানে তাঁহার জীবনের যে প্রকাশ, সে সকলই ভাবলোকের রহস্যময় সত্তার অভিপ্রায়ে হইতেছে। তাই সে সকলকে খণ্ড, বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হইলেও তাহারা পরস্পরের সহিত একটি গভীর অর্থে সংযুক্ত হইয়া একটি নিগূঢ় তাৎপর্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধে কবি স্বয়ং এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই এ একটা ব্যাপার যাহার উপরে আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না, যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ সেই খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি; তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল"।

শুধু শিল্প সৃষ্টির দিক দিয়া নয়, তাঁহার নিজের জীবনের বহু খণ্ড প্রকাশগুলির মধ্যেও যেন একটি অখণ্ডের ইঙ্গিত ধরা পড়িতেছে। এই ভাবটি অন্তর্যামী কবিতায় একটি অপূর্ব্ব কাব্যস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। আপনার ভাবলোকে কবি এক রহস্যময়ী সত্তার আবির্ভাব অনুভব করিতেছেন এবং তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া ধরিতে ছুঁইতে চাহিতেছেন, কিন্তু চিত্রা কাব্যে ইহাকে কবি একটা আবেগের মধ্যে লাভ করিয়াছেন মাত্র, এখানে ইহারসম্ভোগের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, এখনও কবির ইহা পরিপূর্ণ উপলব্ধির বিষয় হইয়া উঠে নাই। তাই এখানে অপরিচয়ের বেদনাই মুখ্য হইয়াছে এবং অরূপসত্তার ধ্যান কবি-মানসের অপূর্ব্ব রসবিলাসে পরিণত হইয়াছে ঃ

নয়ন মেলিয়া উঠিব শিহরি
জানি না চিনিব কি না।
শূন্য গগন নীল নির্মল
নাহি রবি শশী গ্রহমণ্ডল
না বহে পবন, নাহি কোলাহল
বাজিছে নীরব বীণা।

এইরূপে দেখি চিত্রা কাব্যে কবির ভাব জীবনে কবির জীবনদেবতার আসনটি পাতা হইয়াছে। তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে একটি গভীর বিশ্বাস এবং একটি অস্পষ্ট বোধ। জীবনদেবতাকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বাস ও বোধ হইতে ক্রমশঃ কবির জীবনধর্মটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।—"আমার ধর্ম আমার উপচেতন লোকের অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে চেতন লোকের আলোতে যে উঠে আসছে এই লেখাগুলি তারই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন। সে চিহ্ন দেখলে বোঝা যায় যে, সে পথ চেনে না এবং সে জানে না কোন্ দিকে সে যাচ্ছে। পথটা সংসারের কি অতিসংসারের তাও সে বোঝে নি। যাকে দেখতে পাচ্ছে তাকে নাম দিতে পারছে না, তাকে নানা নামে ডাকছে।"

কিন্তু ভাবজীবনে কবি যে পূর্ণতাকে দেখিতেছেন, রূপলোকে খণ্ডের মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই পূর্ণতাকে এখনো উপলব্ধি করেন নাই। 'চিত্রা' কবিতাটিতে কবি রূপলোকে বৈচিত্র্যের মধ্যে এবং আপনার ভাবজীবনে একাকিত্বের মধ্যে যে একই সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন তাহা চিত্রা কাব্যের শেষকথা; ইহা একটি তত্ত্বরূপে এখানে স্বীকৃত হইয়াছে, জীবনে ইহার পরিচয় এখনও কবি পান নাই। ইহারই জন্য রূপলোকের সহিত ভাবলোকের বিরোধ মিটে নাই, যদিও উভয়ের মধ্যে একটি সমন্বয়ের বিশ্বাস কবি অন্তরের মধ্যে পোষণ করিয়া চলিয়াছেন। পরবর্তীকালে তিনি এইরূপ সমন্বয় করিয়াছেন যে, এই অখণ্ড, এই পূর্ণ অরূপসত্তা, খণ্ডের মধ্য দিয়া, রূপের মধ্য দিয়া বিচিত্রভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। ইহা তো রূপবিচ্ছিন্ন একটা নিছক আইডিয়া মাত্র নয়, ইহা রূপের মধ্য দিয়াই বিকাশমান একটা ভাব-সত্য। রূপ যেখানে ইহাকে প্রকাশ করে সেখানে রূপের মহিমা; রূপ যেখানে ইহাকে আচ্ছন্ন করে, সেখানে রূপের দীনতা, রূপের ব্যর্থতা।

কবির এই ভাবজীবন—যেখানে পূর্ণের প্রতিষ্ঠা, সেখানে সমস্ত বিক্ষোভ প্রশমিত, গভীর শান্তি ও স্তব্ধতা সেখানে বিরাজ করিতেছে। এই ভাবলোকে আসিতে হইলে কবিকে রূপলোক ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। কবি এই বিচ্ছিন্নতাকে যখন অনুভব করিলেন তখন এই ভাব-সাধনাকে কবির গীতবিলাস বলিয়া মনে হইল।—

যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ-দিন দীর্ঘ-রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।

রূপলোক হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মগত ভাবসাধনার মধ্যে সমাহিত হওয়ার তৎপরতাকে এক প্রকার 'এস্‌কেপিজম্' বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। যিনি পৃথিবীর কবি, যিনি প্রেমিক, তাঁহার পক্ষে এই এস্‌কেপিজম্ কবি-ধর্মের বিরোধী। কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই বিরোধ দেখা দিয়াছে। 'স্বর্গ হইতে বিদায়' এবং 'এবার ফিরাও মোরে', এই দুইটি কবিতায় ইহার পরিচয় পাই।

'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাটিতে কবি আপনার ভাবস্বর্গ হইতে বিদায় লইবার কথা বলিয়াছেন। স্বর্গে সকলই পূর্ণ; সেখানে চিরন্তন সুখ বিরাজমান। সেখানে সবকিছু আপনার সার্থকতায় ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ত্রুটির ক্ষমা নাই, ক্ষতির স্বীকৃতি নাই। অপূর্ণতা সেখানে লাঞ্ছিত, মহিমা ক্ষয় হইলে সেখান হইতে চলিয়া আসিতে হয়। এহেন স্বর্গলোকে আত্মমহিমায় কবি স্থানলাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু কবির সঙ্গীতের উৎস সেখানে অনেকখানি রুদ্ধ হইয়া যায়, তাঁহার কবি-ধর্ম ক্ষুণ্ন হইতে থাকে। বেদনাই সঙ্গীতের প্রধান উৎস, কিন্তু পূর্ণতার মধ্যে বেদনা নাই। পূর্ণতা হইতে স্তবগান বা বন্দনা জাগিতে পারে, কিন্তু বেদনা হইতে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, পূর্ণতা সে সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে পারে না। স্বর্গের যে মন্দার-মালিকা যে পারিজাত পুষ্প কখনও ম্লান হইয়া যায় না, তাহার দিকে চাহিয়া মুগ্ধ কবি স্তবগান রচনা করিতে পারেন, কিন্তু পৃথিবীর যে ফুল না ফুটিতে ঝরিয়া যায়, তাহাই কবির কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপকরণ। বেদনাবোধ কাব্যসৃষ্টির প্রধান উপকরণ বলিয়া পাওয়া অপেক্ষা না পাওয়া, সুখ অপেক্ষা দুঃখ, জীবনের ছন্দ-রক্ষণ অপেক্ষা ছন্দপতনই অধিক প্রেরণা জোগায়। স্বর্গে পূর্ণতার রাজ্যে এই বেদনার স্বীকৃতি নাই। তাই ছন্দপতন সেখানে প্রশ্রয় পায় না, অশ্রু সেখানে প্রকাশ পায় না, বিরহের ছায়া মিলনের আনন্দকে ম্লান করে না। কাব্যসৃষ্টির এই মূল্যবান উপকরণগুলির অভাবে স্বর্গে কবি-ধর্ম ক্ষুণ্ন ও পীড়িত।

পৃথিবীর কবি তাই এই পূর্ণতার রাজ্য হইতে অপূর্ণ রূপজগতে ফিরিয়া আসিতে আগ্রহ বোধ করিয়াছেন। এই দীন পৃথিবীতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, হাসি-অশ্রু, চাওয়া-পাওয়ার দ্বারা তরঙ্গিত জীবনলীলাকে কবি আনন্দের সহিত মানিয়া লইবেন। তাই স্বর্গের অপ্সরীর অম্লান নয়নজ্যোতি অপেক্ষা কবির কাছে পৃথিবীর প্রেয়সীর শঙ্কিত কম্পিত হৃদয়ের অস্ফুট প্রেমাভিব্যক্তি আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। একটিতে রহিয়াছে পরিপূর্ণ সুখের নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি, আর একটিতে রহিয়াছে ক্ষণিক প্রেমবেদনার তরঙ্গ-বিক্ষোভ; একটিতে সঙ্গীত সমাপ্তির নীরবতা, আর একটিতে গীতসৃষ্টির ব্যাকুলতা। কবি এই তরঙ্গে দোলায়িত হইয়া গীত-মুখর হইতে চাহিয়াছেন। কবি জানেন ইহার মধ্যেই তিনি তাঁহার স্বর্গকে অনুভব করিবেন, এই অপূর্ণতাই পূর্ণতায় বিকশিত হইয়া উঠিবে।—

মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দুঃস্বপ্ন-সম—যবে কোন অর্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি, নির্মলশয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি
গ্রন্থি সরমের; মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর; দক্ষিণ-অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে।

যখন কবি বেদনার মধ্য দিয়া এই রূপলোকের সহিত প্রেমের সংযোগ অনুভব করিলেন তখন, 'অমনি এ স্বর্গলোক অলস কল্পনা প্রায় কোথায় মিলালো ছায়াচ্ছবি।' তখন কবিচিত্ত ইহাকেই সাগ্রহে বরণ করিল।

কিন্তু 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় দেখি, কবি তাঁহার ভাবলোক হইতে পৃথিবীর যে পরিবেশের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে চাহিয়াছেন, সেখানে যে-কোন প্রকার সৌন্দর্যের উৎসারণই রুদ্ধ, সেখানে চরম দৈন্য ত্যহার সকল প্রকার বীভৎসতা লইয়া মুখব্যাদান করিয়া আছে। পৃথিবীর পরিচয় যে সুখের নয়, সেখানে যে প্রেয়সীর বাহুবন্ধন সর্বত্র আনন্দলোক রচনা করিয়া রাখে না, নানা অত্যাচার অবিচার নিপীড়নে আর্তজনের হাহাকার

আকাশ-বাতাস ভরিয়া রাখিয়াছে—পৃথিবীর এই পরিচয়টিও কবিকে গভীর-ভাবে আকর্ষণ করিল। কবির ভাবলোকের সহিত এই পৃথিবীর কোথাও মিল নাই। অথচ এখান হইতে পলায়ন করিয়া কবি যে আত্মগত ভাব-সাধনার মধ্যে নিমগ্ন থাকিবেন তাহা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতেছে না; মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত এই দীন বাস্তব পৃথিবী কবিকে তাঁহার কল্পলোক হইতে নামাইয়া আনিতেছে।

এখানে আসিয়া কবি চারিদিকে শত অভাব দেখিলেন এবং সেই অভাবের মধ্যে আপনার **কবি-কর্মটিকে** যুক্ত করিতে চাহিলেন। সেই কবি-কর্মটি এইরূপ ঃ

সে বাঁশীতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি,……
……তবে ধন্য হবে মোর গান
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।

কবি তাঁহার বাঁশীতে কি সুর শিখিয়াছেন?

কবির সুর আত্মবোধের বাণী। আপনার একক ভাবসাধনায় কবি যে আদর্শের ধ্যান করিয়াছেন, যে মহিমার প্রতি সচেতন হইয়াছেন, তাহাতেই কবি বুঝিয়াছেন যে পৃথিবীতে কেহই দীন নয়। আমরা যদি আমাদের আত্মবোধ জাগাইয়া তুলি, যদি শ্রেয়ের দিকে, পূর্ণতার দিকে দৃঢ়পদক্ষেপে আগাইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমরা তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিতে পারিব।

মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

মানব-মহিমার প্রতি এই যে বিশ্বাস, কবি তাঁহার আদর্শলোক হইতে সেটিকে ধূলির পৃথিবীতে লইয়া আসিবেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শবাদ, তাঁহার জীবনের এই ভাব-সত্যকে অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন না—তাহাকে রূপ-নিরপেক্ষ একটি তত্ত্ব হিসাবে একটা 'ecstacy of art or contemplation—'রস-সাধনার বা ধ্যান-কল্পনার আত্যন্তিক সুখ-সম্ভোগ' হিসাবে দেখিয়া জীবনের সহিত তাহার যোগটির

গুরুত্ব অনুভব করেন না বা জীবনসাধনায় তাহার উপর নির্ভর করেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে ভাব-সত্যকে রূপ-সত্যের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া দেখিতে চহিয়াছেন, এবং রূপ-সত্যকে যাহার অনুগামী করিয়া উভয়ের মধ্যে একটা গভীর ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন, সেই ভাব-সত্যের সাধনাকে অনেকেই জীবনের একটা সার্থক সিদ্ধির পন্থা বলিয়া গণ্য করেন না। সাধারণ মানুষের পক্ষে 'এক রূপ ক্ষণিক চিত্তবিলাস মাত্র' মনে করিয়া তাহাকে জীবনসাধনা হইতে বিযুক্ত করিয়া রাখেন। জীবনের মধ্যে সেই ভাব-সত্যকে রূপায়িত না দেখিয়া তাঁহারা ইহাকে শুধুমাত্র কাব্যের সত্য বলিয়া বিচার করেন এবং এই জন্যই জীবন হইতে তাহাকে বিবিক্ত করিয়া দেখিয়া জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য কবি-মানসের কল্পনা বিলাস বলিয়া ইহার চরম মূল্য নির্দ্ধারণ করেন।

কিন্তু এই attitude বা দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিতে বসিলে রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এমন সত্যকে কখনও স্বীকার করিতে চাহেন নাই, জীবনের সহিত যাহার যোগ নাই বা জীবনের মধ্য দিয়া যাহা উপলভ্য নয়। এই অভিজ্ঞতার জন্য তিনি আপনার ব্যক্তিজীবনের উপর নির্ভর করেন নাই, পরন্তু আপনার মধ্যে এক বিশ্বমানবিক সত্তাকে উপলব্ধি করিয়া সেই জীবনের দর্পণে যাবতীয় সত্যের আলোককে প্রতিফলিত করিয়াছেন। ইহাতে কবির জীবনের সত্য বিশ্ব-জীবনের সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বিশ্ব-জীবনের সত্যকে কবি-কল্পনা বলিয়া মানব-সাধারণ হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার কারণ নাই। 'মানব-সাধারণ' একটি রূপ-সত্য এবং 'বিশ্ব-মানবতা' ইহা হইতেই উদ্ভূত একটি ভাব-সত্য। একটি অপরটিকে ধারণ করিয়া আছে, একটি অপরটির মধ্য দিয়া প্রকাশমান। কবিচিত্ত এই ভাব-সত্যটীকে উপলব্ধি করিয়া রূপ-সত্যের মধ্যে তাহার প্রকাশ দেখাইতে চাহিয়াছে।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছেন, "যে-শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রেয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রা'য় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটীর মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে।" আদর্শবাদী ব্যক্তিমাত্রেই মানুষের জীবনে এই শ্রেয় সাধনার গুরুত্বকে স্বীকার করিবেন। বঙ্কিমচন্দ্রও আদর্শবাদকে জীবন-সাধনার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস যে, এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্মিক হইবে। যতদিন

তাহা না হয়, ততদিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক।....যে যাহা হইতে চায় তাহার সম্মুখে তাহার সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার নিকটবর্তী হইবে।” বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ কৃষ্ণ-চরিত্র। ‘অনুশীলনে’ তিনি সেই আদর্শ ও তাহা লাভের উপায়ের কথা বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এক মানবিক ব্রহ্ম, ‘মানুষের ধর্ম্ম, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শের পথে জীবনের যাত্রাটি দেখাইয়াছেন।

আদর্শকে লাভ করিবার জন্য যে জীবন-সাধনা, সেই জীবন-সাধনাকে, সেই কর্মকে রবীন্দ্রনাথ কোন দিন অস্বীকার করেন নাই। কর্মহীন ভাব-সাধনার মধ্যে আদর্শকে শুধুমাত্র ধ্যানে একটি ভাব-মূর্তিতে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার প্রকাশটি কখনই কর্ম-নিরপেক্ষ নয়। মোহিতলাল রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাটিকে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা যে জীবন-সাধনাকে স্বীকার করিয়াছে তাহাতে “বাস্তবের সহিত প্রকৃত বোঝাপড়া নাই, ক্রুর-কঠিন-কুৎসিতের সহিত সংগ্রাম নাই—সে সকলকে একরকম অস্বীকার করিয়া, সকল অসম্পূর্ণতা সেই ভাবকল্পনা দ্বারা পূর্ণ করিয়া আত্মার মহিমা উপলব্ধি করিতে হয়! ইহা জীবনে শক্তির সঞ্চার করিতে পারে না।...বস্তু ও আদর্শের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা দূর করিবার জন্য ভাব-সাধনাই যদি যথেষ্ট হয়, বস্তুর অসম্পূর্ণতা যদি ভাবের দ্বারাই পূরণ করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে কোন দুঃখ, কোন অভাবই আর থাকে না, জীবনের সহিত যুঝিবার প্রয়োজন হয় না। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি Idealist। বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দও Idealist বটেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হয় জীবনের বাস্তব সাধনা দ্বারা, এজন্য সে ক্ষেত্রে, ভাব-সাধনা নয়—শক্তি-সাধনাই প্রকৃত সাধনা।”

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবি, তাঁহার কর্ম আসলে কবিকর্ম, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তো কোথাও মানবের কর্মকে, তাহার জীবন-সাধনাকে অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে ভাবসাধনা গ্রহণ করিতে বলেন নাই। বস্তু ও আদর্শের মধ্যে ব্যবধান দূর করিবার পথ তিনি তো কবিতা লেখার মধ্যে নিহিত দেখেন নাই। তাঁহার আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে গেলে জীবনের বাস্তব সাধনার প্রয়োজন হয় না এ অসম্ভব ধারণার সৃষ্টি কিরূপে হইল? রবীন্দ্রনাথের সাধনাকে ‘খাঁটি বৈষ্ণব সাধনা’ আখ্যা দিয়া শক্তি-সাধনা হইতে তাহাকে পৃথক করিলেই

সত্য মিথ্যা হইয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ কোনকালে 'খাঁটি বৈষ্ণব' নহেন এবং তাঁহার আদর্শকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করিতে হইলে কর্ম্মনিরপেক্ষ ভাবসাধনাকে অনুসরণ করিলে চলে না। বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ এই দু'জনের জীবনের সত্য যদিও এক হয়, তাহার রূপায়ণ বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের কর্ম শিল্প-কর্ম, কিন্তু আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য বিবেকানন্দ যে ভাবে যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে যেমন একথা বুঝি না যে, আমাদের সকলকেই বেদান্তের ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হইবে, রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতেও তেমনি এ ধারণা করা চলে না যে আমাদের সকলকে ভাবুক ও কবি হইয়া উঠিতে হইবে। আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করিতে গেলে তাহা কদাচ নিছক ভাবুকতার দ্বারা হয় না, তাহার জন্য কর্মসাধনার প্রয়োজন। জীবনের রূপায়নে বাস্তব জীবন-সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও অস্বীকার করেন নাই। পরন্তু যেখানে এই অস্বীকৃতি দেখিয়াছেন, সেখানে কবি ধিক্কার দিয়াছেন। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে কবি এক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছেন,—"আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগলো, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলি নে কেন?' তারা বললে 'কপাল'। আমি বললেম, 'কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিসনে কেন? তারা তখনি বললে, 'আজ্ঞে, কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়।' যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব, তাদেরই জলদান করবার ভার কোন একটি কর্তার। সুতরাং যে করে হোক এরা একটি কর্তা পেলে বেঁচে যায়।" এখানে দেখি রবীন্দ্রনাথ জীবন-সমস্যার সমাধানে 'অমৃত পায়স' বিতরণ করেন নাই, তাহার বাস্তব মীমাংসাই করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে জীবন-সাধনার কথা বলিয়াছেন তাহাকে যাহারা ভাববিলাস বলিয়া দেখেন রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদকে যথাযথ ব্যাখ্যা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

ইহারই জন্য 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির দ্বিতীয় অংশটির, যেখানে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর জীবন-সাধনার কথা বলিয়াছেন—অনেকেই তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা করেন। মোহিতলাল বলেন,—"রবীন্দ্রনাথ বাস্তব দুঃখকে একরূপ অস্বীকার করিয়া এই দুর্গত মনুষ্যসমাজের আর্তনাশের জন্য অতি উচ্চ ভাব-সাধনার পন্থাই নির্দ্দেশ করিলেন; ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির জন্য যে অন্নজল তাহার পরিবর্তে পরম সত্যের অমৃত পায়স, মনুষ্যজীবনের পরিবর্তে বিশ্বজীবন

এবং নিষ্ঠুর নিয়তিরূপিণীর পরিবর্তে নিরূপমা সৌন্দর্য প্রতিমার আধ্যাত্মিক আরাধনাকেই বাঁচিবার একমাত্র উপায় বলিয়া ঘোষণা করিলেন।...যাহারা 'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া' সেই সাক্ষাৎ দুঃখের প্রতিকার চিন্তা না করিয়া, কবি উপদেশ দিলেন—

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা"।

কিন্তু মোহিতলালের এই ব্যাখ্যাটিকে আমরা মানিয়া লইতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে বাস্তব দুঃখকে এড়াইয়া যাইতে চাহেন নাই। একজন রাজনীতিক বা সমাজসংস্কারক জীবনের সমস্যা-সমাধানে যে যুগোপযোগী পন্থা নির্দেশ করিবেন, রবীন্দ্রনাথ সেই সাময়িক আরোগ্যের কথা এখানে বলেন নাই, একথা সত্য—কারণ কবি হইয়া তিনি মানুষের অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করিলেও তাহা মিটাইবার পন্থা নির্দেশ করিবার দায়িত্ব তাঁহার নিজের বলিয়া অনুভব করেন নাই। ইহার জন্য সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির দায়িত্ব রহিয়াছে। আদর্শের পথে মানবের অভিব্যক্তিকে যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই আদর্শের সাধনাই মানুষের মনুষ্যত্ব, ইহা জীবনবহির্ভূত কোন উচ্চাঙ্গের ভাবসাধনা নয়। ইহা কোন প্রকার পলায়নী মনোবৃত্তি নয়। মহাপুরুষেরা মানুষের এই সাধনাকেই নিজ নিজ জীবনে দেখাইয়া যান। জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য কবি এই জীবনসাধনার কথা বলিয়াছেন। এই যে বৃহত্তর জীবন, ইহা দৈনন্দিন তুচ্ছ জীবন হইতে পলায়ন নয়, ইহা সার্থকতার মধ্যে মহিমার মধ্যে আমাদেরই দীন জীবনের অভিব্যক্তি। ইহা বাস্তব জীবনেরই মধ্য দিয়া,—তাহাকে এড়াইয়া আসিয়া কোন নিভৃত একক ভাবরাজ্যের মধ্যে নয়। কবি এখানে আমাদের সকলকে এই বৃহত্তর জীবনের দিকে যাইতে বলিতেছেন। ইহা শুধু তাঁহার নিজের সাধনাই নয়, এই বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিয়া কবি আমাদিগকে বৃহত্তর জগতের মধ্যে ফিরাইতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কদাচ জীবনকে বিস্মৃত হইবার কথা বলেন নাই, তিনি বৃহত্তর জীবন-সাধনার দ্বারা ক্ষুদ্র জীবনকে জয় করিবার কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার অমোঘ বাণী ঃ

কি গাহিবে, কি শুনাবে। বলো মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগত হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

ইহাতে জীবন হইতে পলায়নের কথাও নাই, জীবনকে বিস্মৃত হইবার কথাও নাই। বিকৃত দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত অর্থ অন্য প্রকার। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেই তো আমরা দেখি যে বহু বাসনা-কামনা চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বকে আমরা প্রায়ই তুচ্ছ বলিয়া অস্বীকার করিতে চাই, নতুবা জীবন কেবলই বড় বেশী সীমাবদ্ধ হইয়া যায়, সকল চাওয়াগুলি মিটাইতে গেলে জীবন অগ্রসর হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' বাচস্পতি মশায়ের সকল জাগতিক দুঃখকেই তুচ্ছ বলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-সাধনাকে অস্বীকার করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-সাধনাব যে পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে বাচস্পতির মহাশয়ের মিহিধুতি ও সরু চালের ভাত কোন দিনই জুটিবে না, কিন্তু বাচস্পতির জীবন আর একদিকে পরিপূর্ণতা লাভ করিবে, বাচস্পতি প্রকৃত 'মানুষ' হইয়া উঠিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাচস্পতিকে ধর্মাচরণ করিতে বলিয়াছেন, আদর্শের অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন, বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির সম্যক অনুশীলনের দ্বারা। বস্তুতঃ মানবধর্ম হইতে বিচ্যুতিই সকল দুঃখদুর্দশার মূল ইহাই বঙ্কিমচন্দ্র মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, 'মানুষের যে সকল সুখ-দুঃখ আছে, মানুষের স্বকৃত কর্ম ভিন্ন তাহার অন্য কারণও আছে'; কিন্তু দুঃখ দুর করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মাচরণের কথাই বলিয়াছেন। আদর্শকে ঠিক রাখিয়া বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের জন্য ইহাও এক বাস্তব জীবন-সাধনা।

রবীন্দ্রনাথও মানুষের দুঃখদুর্দশা দুর করিবার নিমিত্ত ধর্মাচরণের কথাই বলিয়াছেন এবং তাহাও বাস্তব জীবন-সাধনা সাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথও আদর্শের পথে জীবনের যাত্রাটি দেখাইয়াছেন। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া দুর্গতদের কথা ভুলিয়া আপনার জীবনদেবতার ধ্যানের কথা বলেন নাই, তিনি জীবনের আদর্শকে রূপ দিবার জন্য বিশ্বের সাধকদের জীবন-সাধনার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং দুর্গতদিগকে সেই জীবন-সাধনা সম্বন্ধে সচেতন হইতে বলিয়াছেন।

'জীবনদেবতা' এই নামে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আপনার করিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন একথা সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপ্রিয়া' 'মহিমালক্ষ্মী' সৌন্দর্যপ্রতিমা' বলিয়া যাহার উল্লেখ করিতে চাহিয়াছেন তাহার মধ্যে কবির জীবনদেবতা-বোধ মিশিয়া থাকিলেও তাঁহার সহিত অন্যান্য সাধকের আদর্শ-বোধের বিরোধ নাই। 'বিশ্বপ্রিয়া' এই নামেই রবীন্দ্রনাথ তাই তাহার পরিচয়

দিয়াছেন। উপরন্তু পৃথিবীর কঙ্করকণ্টকময় পথ 'কোনরূপে অতিক্রম' করিবার কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেন নাই। কবি যে জীবন-সাধনার কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে বাস্তব দুঃখ আছে, অন্তহীন কৃচ্ছ্রসাধন আছে, মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াইয়া সংগ্রাম জয়ের জন্য অকুতোভয়তা আছে ঃ

দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে
সর্বপ্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন
হৃদ্‌পিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষপূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।

এই পংক্তিগুলি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথ যে জীবন সাধনার কথা বলিয়াছেন তাহা বাস্তবতাবর্জ্জিত নিছক ভাববিলাস নহে! ইহাতে জীবনকে কোথাও অস্বীকার করা হয় নাই। এখানে সাধকদের যে জীবন-সাধনার কথা কবি বলিয়াছেন, তাহা শুধুমাত্র ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতে আপনার প্রকৃতিটিকে জানাইয়াছে।

চিত্রা-কাব্যে 'চিত্রা' কবিতাটিতে দেখি জীবনদেবতাকে কবি সম্পূর্ণ দুই বিপরীত সত্য-মূর্তিতে উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু তাহারা তাহাদের বৈপরীত্য লইয়া কবিকে আঘাত দিতেছে না বা বিক্ষুব্ধ করিতেছে না। কবি বৈপরীত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াই উভয়কে গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটা মানসিক শান্তি রক্ষা করিয়াছেন। চিত্র-কাব্যের সর্বত্রই কি রূপানুভূতিতে, কি অরূপানু-ভূতিতে, কবির মানসলোকে এই শান্তিরক্ষার প্রয়াসটি দেখিতে পাই। ভাব-সত্য ও রূপ-সত্যের বৈপরীত্য কবি দুর করিতে পারেন নাই, কিন্তু উভয়ের দ্বন্দ্ব মিলাইতে চাহিয়াছেন। অথচ চিত্রা-কাব্যে স্থির বিশ্বাসের সহিত উভয়ের সম্বন্ধ-সূত্রটিকে উপস্থিত করিতে পারেন নাই বলিয়া একটি 'যদি', 'হয়তো' ইত্যাদির স্পর্শ তাঁহার মনে রহিয়া গিয়াছে, তাহাতে রোমান্টিকতার সুরটি আরও স্পষ্ট হইয়া কাব্য-মাধুর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। পরবর্তী যুগে রূপ ও অরূপের মধ্যে যে একটা সম্বন্ধের, সামঞ্জস্যের বিশ্বাসের উপর জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহারই দিকে কবি আগাইয়া গিয়াছেন। চিত্রার যুগে

ভাবসত্যকে রূপায়িত করিবার সাধনায় প্রার্থিত ও কাম্য সিদ্ধির প্রতি যে ক্ষীণ সংশয়ের সুর লক্ষ্য করি, বলাকার যুগে গভীর বিশ্বাসের মধ্যে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাই না। ভাবসত্যকে এ জীবনে রূপায়িত করিবার যে প্রচেষ্টা, চিত্র্যকাব্যে জীবনের সেই অভিযান সুরু হইয়াছে। চিত্র্যকাব্যের মধ্য দিয়া দৃষ্টিপাত করিলে আমরা তাই এই মহান জীবন-শিল্পীর শিল্পক্রিয়ার প্রকৃতিটি অনুধাবন করিতে পারি এবং তাঁহার বহুদূরবিস্তৃত জীবন-সাধনার মূল সূত্রগুলির সন্ধান পাই।

# চতুর্থ অধ্যায়

## *খেয়া : সাধনজীবন*

১

রবীন্দ্রমানসের আধ্যাত্মিকতার যে পরিচয় আমরা 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র যুগে পাইয়াছি খেয়া কাব্যে তাহাই ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। সুর ধ্বনি ও শিল্পভঙ্গির দিক দিয়া খেয়া কাব্যের মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'খেয়া'র পূর্ববর্তী কাব্যধারা হইতে ইহার একটি পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই পার্থক্যের জন্য অনেকে খেয়া এবং তৎপরবর্তী 'ত্রয়ী' কাব্যকে রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহের মূলধারা হইতে বিচ্যুত পৃথক একটি শাখা বলিয়া গণ্য করেন, অথবা 'খেয়া'র সময় হইতে কবির আধ্যাত্মিকতা একটি নূতন পথ ধরিয়াছে বলিয়া মনে করেন। আবার অনেকে বয়সোচিত প্রবীণ্যের ফল হিসাবে বৈতরণীর নিকটবর্তী মনের স্বাভাবিক ঈশ্বরানুরাগ বলিয়াও খেয়া কাব্যের আধ্যাত্মিকতাকে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ভঙ্গির বৈচিত্র্য আমাদিগকে যেন ভিতরের ঐক্য হইতে দূরে সরাইয়া না দেয়। প্রেয়োজীবন হইতে শ্রেয়োজীবনে অহং হইতে আত্মায়, ব্যক্তি হইতে বিশ্বে রূপ হইতে অরূপে মানব চিত্তের যে অভিসার, রবীন্দ্র দর্শনের তাহাই মর্মবাণী। কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনকে স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া পরিবেশের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়াছেন। বিভিন্ন 'মিডিয়মে'র মধ্য দিয়া পথ চলিবার সময় ঘনত্ব অনুযায়ী একই সূর্যালোকের যেমন বিভিন্ন ভাবে প্রতিসরণ ঘটে, তেমনি পরিবেশের বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রালোকও বিভিন্ন গতিভঙ্গি লাভ করিয়াছে। তাহাতে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা ও বিবিধ সুরমূর্চ্ছনা প্রকাশ পাইলেও

আলোকের স্বভাবটি সর্বত্রই বিদ্যমান। 'মানসী'তে নারী-প্রণয়ের যে দ্বন্দ্ব, 'সোনার তরীতে' বিশ্ববোধের যে রোমাঞ্চ, 'চিত্রা'য় জীবনদেবতার পরিচয় লাভে যে আনন্দব্যাকুলতা, পরবর্তী কাব্যে পট পরিবর্তনের সঙ্গে সেগুলির সাক্ষাৎ আর না পাওয়া যাইলেও, জীবনের মৌল সত্য হইত কবি সরিয়া আসেন নাই। 'মানসী-চিত্রা'র যুগে রবীন্দ্রকাব্যে জীবনের যে ঘনত্ব দেখিতে পাই,' খেয়া'র যুগে জীবনের সেই বস্তু অংশ অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে মনে হয়। কিন্তু ইহার কারণ এই নয় যে কবি জীবনকে ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন অথবা বৈতরণীর কাছে আসিয়া কোন বৈরাগ্য সাধনায় তৎপর হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার যে পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পাইয়াছি, তাহাতে একটি কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, কবি জীবনকে কোথাও অস্বীকার করিতে চাহেন নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া 'মানসী'র প্রণয়দ্বন্দ্ব যে চিরকাল থাকিবে এমন কথা নয়, অথবা সমুদ্রমেখলাপরা ধরিত্রীর কটিদেশকে বেষ্টন করিবার রোমান্তিকতাও যে কবিকে আবিষ্ট করিয়া রাখিবে তাহাও নয়। রবীন্দ্র-জীবন-সাধনায় সব কিছুর মধ্যে বৃহতের প্রতি প্রেমই প্রকাশ পাইয়াছে। সেই প্রেমাকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ধ্বনি লাভ করিয়াছে। খেয়া কাব্যে কবি বৃহতের প্রেমে আপনার মধ্যে আপনি আবিষ্ট হইয়াছেন। এখানে প্রেমের বিষয় বাহিরে নয়, অন্তরে ; এখানে জীবন বিশ্বে বিস্তৃত নয়, বিশ্ব এখানে আপনার মানসধ্যানে সমাহৃত। ইতিপূর্বে বিশ্বের মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিবার আকাঙ্ক্ষায় কবি বেদনার্ত ছিলেন, নব বসন্তের ফুলসুগন্ধ-গগনে কবির মিলন বিহীন চিত্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়াছে। এই বেদনায় জগতের অনুপরমাণুর মধ্যে প্রেমকে আঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। কবি ভোলেন নাই যে রাজার সিংহ-দুয়ারে তিনি বাঁশি বাজাইবার ভার পাইয়াছেন। সেই সঙ্গীতকে কবি বিশ্বে সর্বত্র ধ্বনিত দেখিয়াছেন—

স্থান ভেদে তব গান—মূর্তি নব নব ,
সখাসনে হাস্যোচ্ছ্বাস, সেও গান তব,
প্রিয়াসনে প্রিয়ালাপ শিশুসনে খেলা
জগতে যেথায় যত আনন্দের মেলা
সর্বত্র তোমার গান বিচিত্র গৌরবে
আপনি ধ্বনিতে থাকে সরবে নীরবে।

এই গীত-সাধনায় সংশয় প্রকাশ করিয়া যদি কেহ বলেন—

'তাঁর ভৃত্য হয়ে তোর এ কী চপলতা,
কেন হাস্য-পরিহাস, প্রণয়ের কথা,
কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীতরসে
ভুলাস এ সংসারের সহস্র অলসে'।

কবি তখন তাহার উত্তর দিয়াছেন—

ওগো পক্ককেশ
আমর বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ,
যে আনন্দে যে অনন্ত চিত্তবেদনায়
ধ্বনিত মানব প্রাণ, আমার বীণায়
দিয়েছেন তারি সুর—সে তাঁহারি দান
সাধ্য নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান।

'উৎসর্গ' কাব্যে সেই বিশ্বসংগীতে মুগ্ধ চিত্তের উৎসর্গই দেখিলাম। তাহার পরেই 'খেয়া' কাব্যে সহসা মনে হইল গান বুঝি থামিয়া গিয়াছে। যোগিয়া-সারঙ-পূরবী-ইমনে যে বিচিত্র তানের খেলা চলিতেছিল. সহসা দেখিলাম, সেই তান লয়ের বৈচিত্র্য হইতে গায়ক সরিয়া আসিয়া দরবারী কানাড়ায় আলাপ ধরিয়াছেন—

কালো জলের কলকলে
আঁখি আমার ছলছলে
ওপার হতে সোনার আভা
পরাণ ফেলে ছেয়ে।

এই সঙ্গীতালাপ কি আকস্মিক, ইহা কি সম্পূর্ণ অভাবনীয়? আমরাও কি ইহার অপেক্ষায় ছিলাম না? বাহিরকে আশ্রয় করিয়া যে প্রেমাকাঙ্ক্ষা বার বার কবি চিত্তে জাগিয়া উঠিতেছিল, সেই প্রেমকে কবি কি একবার আস্বাদন করিয়া দেখিবেন না? সেই প্রেমের পরম রূপটি কী, কবি তাহার আভাস ক্ষণে ক্ষণে পাইয়াছেন, এখন সেই প্রেমকেই কবি ধ্যান করিতে চাহেন, এখন সেই প্রেমের প্রতিই কবির প্রেম। ইতিপূর্বে আর একজন কবি এই প্রেমের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি হইলেন কবি বিহারীলাল। কবি বিহারীলাল বলেন—

প্রেমের আভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়,
তাইতো প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয়।
প্রেম ধ্যান, প্রেম জ্ঞান, প্রেম প্রাণমন,
প্রেমেরই জন্যেতে যেন রয়েছে জীবন।

এ প্রেম তত্ত্বের দিক দিয়া অ্যাব্‌স্‌ট্র্যাক্ট, কিন্তু সত্যের দিক দিয়া বিশ্বই ইহার আশ্রয়। এই বিশ্বজীবনগত প্রেমকে কবি তাহার স্ব-ভাবে আস্বাদন করিতে চাহিতেছেন, ইহার জন্য কবির মধ্যে একটি ধ্যানের জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং যে চিত্ত-শরকে কবি বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবার তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। তীরকে বাহিরে নিক্ষেপ করিতে গেলে তাহাকে একবার নিজের দিকে টানিতে হয়, 'বলাকা' পর্যায়ে কবিচিত্তের যে বিশ্বমুখী প্রচণ্ড গতি, তাহার পূর্বে চিত্তকে নিজের দিকে আকর্ষণের এই অধ্যায়টি রহিয়াছে। বৃহতের প্রতি প্রেমকে কবি এখানে আপনার মধ্যে আস্বাদন করিয়াছেন। খেয়া কাব্যে তাই এক অভিনব আত্মরতি প্রকাশ পাইয়াছে, যদিও এই আত্মরতির মধ্যে বিশ্ববোধ স্তম্ভিত হইয়া আছে।

'উৎসর্গ' কাব্যে কবি বলিতেছেন—

মোর কিছু ধন আছে সংসারে
বাকি সব ধন স্বপনে
নিভৃত স্বপনে।

বৃহতের যে প্রেম কবির পরম প্রাপ্তির বিষয়, বাহিরের সংসারে তাহাকে কতটুকু লাভ করা যায়, বাহিরে নানা বাধার মধ্যে এ প্রেম তো খণ্ডিত। প্রেমের শুভ্র দীপ্তি সেখানে তো বারবার ম্লান হইতে দেখা যায়, বিশ্বাস বারবার ভাঙ্গিয়া যায়, সুখ-শন্তি বার বার অন্তর্ধান করে। কিন্তু কবি এই সংসার জীবনের বহু ভাঙাচোরার মধ্যেই তাঁহার নৈবেদ্যটি সাজাইয়াছেন। যাঁহার উদ্দেশ্যে সাজাইয়াছেন, তিনি কিছুটা সংসারে প্রকাশিত কিছুটা আছেন সংসারের অতীতে,—কবির ধ্যানলোকে। সেই ধ্যানজগতে প্রবেশ করিয়া একবার সেই প্রেম-স্বরূপের স্পর্শ লইয়া আসিতে সাধ যায় না কি?

সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া

কিন্তু,

করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রেখে দিও তার একটি দুয়ার খুলিয়া।

সেই খোলাদ্বার দিয়া কবির স্বপনবিহারী কবির কাছে আসিবেন। সংসারে বস্তুজীবনের মধ্য দিয়া কবি সব সময়ে তাঁহার কাছে যাইতে পারেন না, তিনিও কবির কাছে আসিতে পারেন না। তাই কবি 'নৈবেদ্য'তে ঘরের একটি দ্বার খুলিয়া দিয়া 'উৎসর্গে' তাঁহার গোপন বাসনাটি জানাইলেন—

রাজপথ দিয়ে আসিও না তুমি,
পথ ভরিয়াছে আলোকে
প্রখর আলোকে।
সবার অজানা, হে মোর বিদেশী,
তোমারে না যেন দেখে প্রতিবেশী,
হে মোর স্বপন বিহারী।

—তাহা হইলে কেমন করিয়া তাঁহার সহিত কবির দেখা শোনা হইবে?—

তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে
চিনিব বিরলে নেহারি
পরম পুলকে
এসো প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে,
এসো না পথের আলোকে
প্রখর আলোকে।

খেয়া কাব্য এই প্রদোষের কাব্য—এই গোধূলি লগ্নের কাব্য। ইহার মধ্যে সজল আঁখির পল্লব স্পন্দন রহিয়াছে, প্রাণের পরমপুলকের অস্ফুট গুঞ্জন রহিয়াছে। ইহার ভাষা তাই অত্যন্ত সুকুমার, ইহার ভঙ্গি তাই অভিনব।

বৃহতের প্রেম কথায় ইতিপূর্বে আমাদের জীবনের রূপচিত্রগুলি কবির কাব্যে দেখিয়াছিলাম; এখন সেই বৃহতের উপলব্ধিতে আমাদের জীবনের কতকগুলি রূপকচিত্র কবি গ্রহণ করিয়াছেন, কবি সঙ্কেতের দ্বারা, ব্যঞ্জনার দ্বারা আপনার সুকুমার অনুভূতিগুলি এবং সেই বৃহতের কথা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। খেয়া কাব্যের ভাষা তাই সাঙ্কেতিক ভাষা, কাব্যটি তাই বাচ্যার্থ প্রধান নহে, ব্যঙ্গার্থ প্রধান। ইহাকে আমরা মার্মিক ভাষা বলিতে পারি। মার্মিক শব্দটি আসিয়াছে মর্ম হইতে [ মর্ম+ষ্ণিক ]। সত্যোপলব্ধির এমন অবস্থা আছে যখন বুদ্ধির দ্বারা তাহাকে অনুসরণ করা যায় না,

তাহাকে বিচার বিশ্লেষণের বিষয় করিতে পারি না ; ভাবুক তাহা আপনার মর্মে আপনি অনুভব করেন।

এই মার্মিকতায় যিনি উন্নীত নহেন, তাঁহাকে ইহা বুঝাইবার উপায় নাই। এই মর্মের সত্যকে মরমী ভাষায় উপস্থিত করিতে হয়। মরমী ভাষা—অর্থাৎ, মর্মের সুকুমার অনুভূতির আলোকোদ্ভাসিত ভাষা এ বাণী অননুভূত-পূর্ব অনুভূতির বাণী। এ বাণী যাহাকে প্রকাশ করিতেছে, তাহা আমাদের গতানুগতিক বোধ ও বুদ্ধির অধিগত নয় ; তাহার জন্য আমাদিগকে বৃহতের চেতনায় জাগ্রত হইতে হইবে, বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করিতে হইবে।

তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, বৃহতের প্রেমাকাঙ্ক্ষায় কবি এক গোধূলি-লগ্নের পরিবেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এখন একদিকে কবির বস্তু-জীবন, তথা কর্মজীবন—ইহাকে কবি দিনের জীবন বলিয়াছেন; আর এক-দিকে কবির ভাবজীবন তথা ধ্যান-জীবন, ইহাকে কবি রাত্রির জীবন বলিয়াছেন। এই দিন-জীবন শেষ হইয়া রাত্রি-জীবনের যখন সুরু সেই গোধূলি লগ্নে কবি সংসার জীবনের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া গান ধরিলেন—

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া
ভুলালে রে ভুলালো মোর প্রাণ
ও পারেতে সোনার কূলে আঁধার মূলে কোন মায়া
গেয়ে গেল কাজ ভাঙানো গান।

দিন-জীবনের শেষে রাত্রি-সৌন্দর্যের গভীরতা কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমরা সাধারণতঃ দিন-জীবনকেই একমাত্র করিয়া তুলি ; কেবল কর্ম করি আর কর্ম করাই, বস্তুজীবনে ব্যস্ত হই আর ব্যস্ত থাকি। কাজ করাকেই জীবনের একমাত্র বিষয় করিয়া দেখি, ইহার অতীতে জীবনের আর কোন অধ্যায় চোখে পড়ে না। বস্তুজীবনে কর্মের নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করি, ইহাতে একদিকে যেমন বস্তুজীবনে লাভের অঙ্ক বাড়িতে থাকে, তেমনি অপর দিকে জীবনে নানা ঘূর্ণীরও সৃষ্টি করি। ইউরোপ এই বস্তুজীবনকেই আজ বড়ো করিয়া দেখাইতেছে তাই দিনের প্রখর আলোক কিছুতেই আর কমিতেছে না। রাত্রিজীবনকে সে অস্বীকার করিতে চাহিতেছে, তাই দিনের আলো সে ম্লান হইতে দেয় না, কৃত্রিম আলোতে রাত্রির অন্ধকারকে দূরে সরাইয়া রাখিতে চায়।

খেয়া কাব্য এই বস্তুদর্শনের বিরুদ্ধে প্রসন্ন প্রতিবাদ। বিশ্বপ্রকৃতিতে রাত্রি যেমন দিনের বিরোধী নয়, দিনের পর স্বাভাবিকভাবেই রাত্রি আসিবে, তেমনি মানব প্রকৃতিতে বস্তুজীবন তথা কর্মজীবনই একমাত্র নয়, কর্মান্তে স্বাভাবিকভাবেই ধ্যানের অবকাশ রচিত হইবে। দিন ও রাত্রি লইয়া যেমন বিশ্বপ্রকৃতির পূর্ণতা, কর্ম ও ধ্যান লইয়া তেমনি মানবপ্রকৃতির পূর্ণতা। ধ্যানবিহীন কর্ম কর্মের বিড়ম্বনা মাত্র। ধ্যানের জগৎ হইতে, ভাবের সমুদ্র হইতে জোয়ার আসিয়া আমাদের ঘরের জীবনটি ভরাইয়া রাখিয়াছিল, আমাদের দিনের কাজগুলি আমরা সমাধা করিতেছিলাম। এইবার আবার সময় হইয়াছে, ভাটার টানে এইবার সেই ভাবসমুদ্রের দিকে, সকল কর্মের প্রেরণার মূল উৎসের দিকে চলিতে হইবে। বস্তুজীবনকে তুচ্ছ করিয়া, তুচ্ছ কর্মকে অস্বীকার করিয়া সেই ভাঁটার টানে ধ্যানজীবনের পথিকেরা পথ চলিয়াছেন; কবি তাঁহাদের দিকে বিভোর হইয়া চাহিয়া আছেন তাঁহাদের সঙ্গ ধরিবেন বলিয়া।

কিন্তু বৃহতের স্বপ্নানন্দে যাঁহারা পথ চলিলেন, যাঁহারা ভাবের সাধক বাহির হইতে তাঁহাদের ধ্যানগাম্ভীর্যের প্রশান্ত মূর্তি সকলেরই তো সমান। কিন্তু সাধনার বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। রাত্রি-জীবনের ছায়ায় যাঁহারা পথ চলিয়াছেন, সেই ছায়ান্ধকারে তাঁহাদের সাধনার বিভিন্ন স্তর, গতি ও লক্ষ্য তো বুঝিয়া উঠিবার উপায় নাই। ভাঁটার টানে যখন ওপারে একটি দুটি তরী ভাসিয়া যাইতে দেখিতেছেন, তখনই কবির মনও আকুল হইয়া উঠিতেছে, রাত্রি-জীবনে প্রবেশ করিবার একটি আকুতি অনুভব করিতেছেন।

কিন্তু কবি কাহাকে অনুসরণ করিবেন? রাত্রি-জীবনে যাঁহারা প্রবেশ করেন তাঁহারা সাধারণতঃ আর দিন-জীবনে ফিরিয়া আসেন না। কবি রাত্রির গভীরে প্রবেশ করিবেন দিন-জীবনে আর ফিরিবেন না বলিয়া নয়। কবি ফিরিবেন; বিশ্বপ্রকৃতিতে দিনের পর যেমন রাত্রি এবং রাত্রির পর পুনরায় দিন, তেমনি মানবপ্রকৃতিতে কর্মান্তে ধ্যান-বিশ্রাম এবং তাহার পর বিশ্রামান্তে নবতর উদ্যমে অভূতপূর্ব কর্ম। তাই রাত্রিজীবনে প্রবেশ করিবার অর্থ কবির কাছে ইহাই নয় যে, কবি আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করিবেন না। কবি সন্ধ্যার অনুগামী হইয়াছেন নূতন উদয়াচলের তীর্থে উপনীত হইবার জন্য। তাই কবি সেই নৌকার যাত্রী হইবেন, যে নৌকা তাঁহার ঘাটে, তাঁহার দেশে আছে, অর্থাৎ তাঁহার জীবনাদর্শে বিশ্বাসী যে।

বসন্ত বাতাসে মত্ত হওয়ার মন যাহার নাই, মন-দেওয়া-নেওয়ার পালা শেষ হইয়াছে যাহার জীবনে, তুচ্ছ চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে জড়াইয়া পড়িতে যাহার আর বাসনা নাই, দিনের আলোর প্রখরতা—বস্তুজীবনের ব্যস্ততা যাহার কমিয়াছে, বৃহৎকে বরণ করিবার জন্য সে একবার ঘর ছাড়িয়া পথে নামিতে চায়; কিন্তু সংসারকে ত্যাগ করিবার সন্ন্যাসিতা নয়,' তুচ্ছ ভোগে লিপ্ত হইবার স্থূল আসক্তিও নয়—বৃহতে রতি ও তুচ্ছে বিরতি, শ্রেয়োজীবনে অনুরক্তি ও প্রেয়োজীবনে অনাসক্তি—জীবনের এই মধ্য পথের পথিক তিনি। কর্মান্তে খেয়া পার হইয়া সেই মধ্যগজীবনে প্রবেশ করিবার আহ্বান আসিয়াছে।

একটি বিশিষ্ট মানস-পরিবেশের মধ্যে প্রেয়োজীবন হইতে শ্রেয়োজীবনে পারাপারের কথাই খেয়া কাব্যে অভিনব সুরমূর্ছনা লাভ করিয়াছে। প্রেমকে এখানে ভাবস্বরূপে abstract করিয়া দেখা হইলেও এই প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত বাস্তবের একটি বৃহত্তর রূপও এখানে ধরা পড়িয়াছে। প্রেমের ধ্যানটি একদিকে কবিকে যেমন মার্মিক ভাষা যোগাইয়াছে, অপর দিকে একটি বৃহত্তর বাস্তবের বোধেও কবিকে উজ্জীবিত করিয়াছে। আমাদের জীবন বস্তুধর্মিতায় আচ্ছন্ন, তুচ্ছ বিষয়ে আমরা লিপ্ত; বৃহতের প্রেম-দীক্ষায় আমাদিগকে খেয়া পার হইয়া জীবনের গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে। এই বৃহতের বার্তাটি কাব্যের বাচ্যার্থের মধ্যে নাই, বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া তাহার কাছে পৌঁছিতে হয়। এখানে "পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে সে যে প্রাণের কথা।" কাব্যের বাচ্যার্থ হইতেও একপ্রকার অর্থ বোধ হয়, কিন্তু সে অর্থ লোকায়ত। কাব্যের মর্মার্থ পাতার ভাঁজে ঢাকা রহিয়াছে, পাতার ভাঁজ খুলিয়া সেই অর্থটিকে আস্বাদন করিতে হইবে। তাহার জন্য মার্মিক [illegible] অনুভব করিবার মতন সংস্কার থাকা চাই। এই সংস্কার সম্বন্ধে কবি বা —

আনো তোমার তড়িৎ-পরশ
হরষ দিয়ে দাও,
করুণ চক্ষু মেলে ইহার
মর্ম পানে চাও।

তাহা হইলে দেখিতে পাইবে—

সারা দিনের গন্ধগীতি
সারা দিনের আলোর স্মৃতি
নিয়ে এ যে হৃদয় ভারে
ধরায় অবনতা—
আমার লজ্জাবতী লতা।

এই সংস্কারের অভাবে খেয়া কাব্যের রসাস্বাদন যেমন সম্ভব নয়, তেমনি ইহাকে বুঝাইতে যাওয়া নিদারুণ মূঢ়তা। আমরা যে জগতে প্রবেশ করি নাই সে জগতের কথা ব্যাখ্যা করিব কেমন করিয়া? আমরা শুধু জিজ্ঞাসার কয়েকটা ঢিল ছুঁড়িয়া সেই ভাব-সরোবরে কতকগুলি তরঙ্গ তুলিতে পারি মাত্র, কতকগুলি শব্দ তুলিয়া তাহার স্তব্ধতাকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারি মাত্র; কিন্তু আমরা সেই সরোবরে অবগাহন করি নাই, কেমন করিয়া তাহার কথা বুঝাইতে পারিব? শুধু তাহাই নহে, কবি যে মার্মিকভাষা প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের সমালেচেনার ভাষায় তাহাকে ধরিতে গেলে বার বার বিড়ম্বনারই সৃষ্টি হইবে। আমরা তাই কাব্যের রসরূপটি তথা আনন্দরূপটি পাঠকের কাছে উপস্থিত করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া শুধু বিষয় বস্তুর দিক দিয়া ইহার মধ্যকার 'জীবন-মৃত্যু রৌদ্র-ছায়া ঝটিকার বারতাটি পাঠ করিবার প্রয়াসে লজ্জাবতী লতার পাতার ভাজগুলি একটু খুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

( ২ )

কবি তাঁহার ধ্যানের জগৎটির কথা কতকগুলি কবিতায় গভীর শিল্প-নৈপুণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার জন্য কবি কতকগুলি রূপকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন, যেমন:—ঘাট, দিঘি, আকাশ, সমুদ্র প্রভৃতি। এবং ধ্যান-জীবনের আনন্দানুভূতিকে ইহারই ভূমিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। ঘাট কথাটির দ্বারা এপার ও ওপার এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী জীবনের কথা বলা হইয়াছে। 'ঘাটের পথ' কবিতায় বস্তু-জীবন হইতে ধ্যান-জীবনে প্রবেশের কথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন। জীবনের যে ক্ষেত্রটি বস্তু-বিদ্যার দ্বারা ধরিতে পারি না অথচ যাহাকে সত্য বলিয়া জানি,—তাহাই হইল পথ। পথে আসিবার অর্থ-ই হইল বস্তুর বন্ধনকে কিছুটা তুচ্ছ বলিয়া মানা। অথচ পথে প্রাপ্তি নাই শুধু একটি বিশ্বাস রহিয়াছে। ভরা

কলসের ভার লইয়াই কবি এই পথে আসিতে পারেন, অর্থাৎ সংসারকে স্বীকার করিয়াই কবি সংসারকে অতিক্রম করিতে চাহেন। ঘরের জীবনকে একমাত্র বলিয়া জানিলে তাহাতে বন্ধনের সৃষ্টি হয়; আবার ঘরকে ভুলিয়া গিয়া শুধুমাত্র পথকেই একান্ত করিয়া তুলিলে আশ্রয়হীন চিত্ত দিশাহারা হইয়া পড়ে। ঘরের বস্তু সর্বস্ব বন্ধন নয়, তাহার মমতাটুকু, পথের দিশাহারা মুক্তি নয়, তাহার আনন্দটুকু,—ইহাই কবির প্রার্থনীয়। কিন্তু বদ্ধজীবনে তো ইহা সহজ নয় : পথটি তাই বাঁকা পথ। এই বাঁকা পথে চলিবার জন্য বেদনার আহ্বান আসিয়াছে। শুধু বস্তুবিদ্যায় সে বেদনার কারণ নির্দেশ করিতে পারি না, তাই সে আকুলতাকে অকারণ বলিয়া মনে হয়। এই অকারণ আকুলতায় আপনার মনে একা পথ চলি—একাকিত্বের সাধনায় তৎপর থাকি। এখানে একাকীই যে চলিতে হয়; সঙ্গী আর কেহ নাই, সঙ্গী হইল আমার অন্তরের সেই অস্ফুট বোধটি, সেই অনির্বচনীয় আনন্দটি। সেই একাকী পথ চলিতে চলিতে—"কাঁখের কলসী বলে ছলছলি জলভরা কলকথা—যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা"। এই পথ চলিতে চলিতে জলভরা কলকথা শুনিতে পাই—প্রাপ্তির ভাষাগুঞ্জনে কাব্য জাগে, জাগে ছন্দ। এই পথে আসিবার আনন্দটুকু কেমন করিয়া কবি বুঝাইবেন; কেমন করিয়া বুঝাইবেন, বস্তুজগৎ হইতে ধ্যান জগতে প্রবেশ করিবার সে কি উল্লসিত আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চেতনায় সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে!

ওগো, দিনে কতবার করে
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ঐ পথ ডাকে মোরে।
কুসুমের বাস ধেয়ে ধেয়ে আসে
কপোত-কূজন-করুণ আকাশে
উদাসীন মেঘ ঘোরে—
ওগো, দিনে কতবার করে।

কুসুমের বাস ধেয়ে ধেয়ে আসে—অপ্রয়োজনের আনন্দ আমাকে বার বার আহ্বান জানায়—আহ্বান জানায় তুচ্ছ হইতে বৃহতে, প্রেয় হইতে শ্রেয়ে পথ চলিবার জন্য। ধ্যানজীবনে প্রবেশের পূর্বে সেই পথে চলা—ইহাও গভীর আনন্দ জাগায়। এই পথে বাহির হইব বলিয়াই চারিদিকে যেন আয়োজন

চলিতেছে, নীল আকাশে কাহার যেন উদার দৃষ্টি হাসিয়া উঠিয়াছে। পথের শেষে যে রহস্যময় ধ্যানজগৎ, তারই অন্ধকার হইতে যেন রূপমূর্তি জাগিয়া উঠিয়া কবিকে আনন্দময় প্রাপ্তির নানা ইঙ্গিত দিতেছে। সেই কালো লহরীর মাথায় মাথায় চঞ্চল আলো তুলিয়া উঠে—অরূপ হইতে রূপের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়া কবিকে আহ্বান জানায়। এই পথে কবি যে এই প্রথম চলিতেছেন তাহা নহে, 'সোনারতরী' হইতে এই পথ-চলা কবির জীবনে সুরু হইয়াছে। সেই পথ-চলাকেই এখানে কবি আর এক মানস পরিবেশের মধ্যে আস্বাদন করিয়াছেন।

আমি গিয়েছি আঁধার সাঁজে
শিহরি শিহরি উঠে পল্লব
নির্জন বন-মাঝে।
বাতাস থমকে, জোনাকি চমকে
ঝিল্লির সাথে ঝমকে ঝমকে
চরণে ভূষণ বাজে
আমি গিয়েছি আঁধার সাঁজে।

অন্ধকারের মধ্যেও আমি ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছি। ঘর ছাড়িয়া অন্ধকার পথেও তবে আসা যায়—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। এই বিস্ময়টি যেন একটি হিল্লোল তুলিয়াছে,—সমস্ত বনভূমি যেন থমকিয়া, চমকিয়া এই অভিনব অভিসারটি দেখিতেছে, আমার জীবনে বৃহতের ভাবমোহে এ যে এক অভিনব অধ্যায়,—এ অভাবনীয়তায় শিহরণ জাগে সমস্ত সত্তায়। তবু এই বিস্ময় ও শিহরণকে ছাপাইয়া পথ চলার আনন্দই চরণের ভূষণ ঝঙ্কারে প্রকাশ পাইতে থাকে।

এপার এবং ওপারে মাঝখানে কল্পনার বাসা বাঁধিয়াছেন যে কবি,—যিনি ঘাটের কবি,—পথ চলার আনন্দে বিহ্বল হইয়া শিল্প-চেতনায় তিনি উদ্বেজিত হইয়াছেন। যে সকল সাধক রাত্রি-জীবনে প্রবেশ করিয়া একেবারে সমাহিত হইতে চান, তাঁহারা সাধারণতঃ এই অন্তর্বর্তী অবস্থাটিকে আস্বাদন করার কথা বলেন না। এই অবস্থাটি উত্তীর্ণ হইয়া চরম লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্যই তাঁহাদের সাধনা। পথ-চলাটি শেষ করিতে পারিলেই তাঁহারা চরিতার্থ হন, তাই পথ-চলাটি তাঁহাদের কাছে সঙ্গীতের প্রেরণা হইয়া উঠে না। কবি

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পথকেই আস্বাদন করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। পথে নামিয়াই কবি উল্লসিত, পথ চলিয়াই কবি প্রাপ্তির আনন্দে বিহ্বল। রাত্রির গভীরে প্রবেশ করিবার অবকাশ এখনও আসে নাই তবু দিনের প্রখর আলো, বস্তুজীবনের গ্লানি এই যে একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিতেছে তাহাতেই চিত্ত কানায় কানায় ভরিয়া উঠিতেছে। উপমা দিয়া বলিতে গেলে এই ভাবে বলিতে হয়—অঙ্কের পরীক্ষা দিবে যে ছাত্র, বহু অধ্যয়নের তাহার প্রয়োজন; কিন্তু সুরুতেই একটি অঙ্ক যখন মিলিয়া গিয়াছে, তখন মনে আনন্দ হয়, আশা জাগে—বুঝি সব অঙ্কগুলিই তবে কষিতে পারিবে। তখনও সাধনার দীর্ঘপথ বাকী, তথাপি একটা অঙ্ককষার আনন্দে চিত্ত ভরপুর হয়, সেই আনন্দে পরীক্ষা পাশের আনন্দকে যেন স্পর্শ করিয়া যাই, এমন কি পরীক্ষায় পাশ করিয়া গিয়াছি, এমন একটা ভাববিলাসেও চিত্ত আবিষ্ট হয়। প্রথম অঙ্ক মিলিয়া যাওয়ার আনন্দের মতই খেয়া কাব্যে কবি চিত্তে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। তাই ঘাটে বসিতে পাইয়াই কবির আনন্দ—

আমার নাই বা হল পারে যাওয়া
যে হাওয়াতে চলত তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া।

দিনের অবসানে গোধূলি লগ্নে বৃহতের সঙ্গে জীবনসত্তার যেন শুভ পরিণয় ঘটিবে। সে আসিলে হৃদয় যে আনন্দে পুলকিত হইবে, সেই আনন্দের স্বপ্নই এখন প্রধান কথা—

বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে,
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে,
বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
নবমিলনের সাজে।

খেয়া কাব্য তাই এক অভিনব আত্মরতির কাব্য। এখন প্রাপ্তির স্বপ্ন-ধ্যানেই কবিচিত্ত পুলকাকুল। ইহার পর অবশ্য প্রাপ্তিকে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চাহিয়াছেন, তখন এই স্বপ্নাবস্থা দূর করিয়া বলিয়াছেন—

এই কথাটা ধরে রাখিস
মুক্তি তোরে পেতেই হবে,
যে পথ গেছে পারের পানে
সে পথে তোর যেতেই হবে। (গীতালি-৪৭)

এখন কিন্তু গোধূলি লগ্নে এই একটি ভাব-বিলাসে কবি চিত্ত আবিষ্ট যে,—

তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার
কে লইবে টানি বাহুটি আমার
আমায় কে জানে, কী মন্ত্রে গানে
করিবে মগন রে।

ধ্যানজীবনের আনন্দানুভূতির কথা 'দিঘি' কবিতায় কবি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। দিনের দাহ যখন কিছুটা মিটিয়াছে, বস্তুজীবনের পীড়নে যখন চিত্ত পরিশ্রান্ত, তখন একবার ধ্যানজীবনে প্রবেশ করিয়া গভীরের আস্বাদন লইয়া আসিতে হইবে না কি? সেই ধ্যানের জগৎটি কিরূপ?— 'সামনে আসে বাক্যহারা স্বপ্নভরা রাত, সকল কর্মহীন।'—দিনের জীবন শেষ করিয়া রাত্রি-জীবনে প্রবেশ করিতে হইবে। সে জীবনে কোলাহল নাই, তুচ্ছ কর্মের প্রয়াস নাই; বৃহত্তর জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, শ্রেয়ের বার্তা মধুর স্বপ্নের মত মোহাচ্ছন্ন চেতনায় নানা চিত্র আঁকিয়া যায়। সেই স্বপ্নভরা রাত্রির সূচনায় আপন আত্মানুভূতির মধ্যে এইবার একবার ডুব দিতে হইবে। সেই ধ্যানজীবন হইতে ডাক আসিয়াছে,—গোধূলিলগ্নে দিঘি কবিকে আহ্বান করিয়াছে।

দিঘিটি কিরূপ?—

কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো
শীতল জলরাশি,
নিবিড় হয়ে নেমেছে তায় তীরের তরু হতে
সকল ছায়া আসি।

বস্তুজীবনের মধ্যে কত ফাঁক, কত অপূর্ণতা, কিন্তু এই ধ্যানের জীবনটি পরিপূর্ণ, সেখানে সকল ফাঁক ভরাট হইয়া গিয়াছে। তাই তাহার রূপটি নিটোল; তাহা গভীর এবং রহস্যময়, তাই 'ঘনকালো'; বস্তুবুদ্ধি দিয়া সে জগতের পরিচয় পাই না, তাই তাহাকে অন্ধকার দেখি। তাহা নিটোল, গভীর,—কিন্তু নিরেট নয়, কঠিন নয়; তাহার মধ্যে ছিদ্র নাই, ফাঁকি নাই, কিন্তু তাহা দুষ্প্রবেশ্য নয়; তাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায়, অবগাহন করা যায় এবং এই অবগাহনে বস্তুজীবনের সকল শ্রান্তি দূর হয়, সমস্ত সত্তাটি গভীর প্রশান্তিতে স্নিগ্ধ হয়; তাই তাহা হইল, 'শীতল জলরাশি'। ইহার বর্ণনায় কবি আরও বলিতেছেন—

পাশে তোমার ধূলার ধরা কাজের রঙ্গভূমি
প্রাণের নিকেতন,
হঠাৎ থেমে তোমার পরে নত হয়ে পড়ে
দেখিছে দর্পণ।

ধূলার-ধরণী এই দিঘির পাশেই রহিয়াছে, এই ধ্যানের জীবন সেই কাজের রঙ্গভূমি হইতে অধিক দূরে নয়। সংসার সেই ধ্যানের জগতের দিকে চাহিয়া আছে। সেই দিকে চাহিয়া সংসার আপনার হাসিকান্না সুখদুঃখের লীলাগুলির চরম তাৎপর্য কি দেখিতে পায়? সেই দিঘির দর্পণে তাহার কোন আন্তর-মূর্তি কি প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে?

বস্তুজীবনের দহনে চিত্ত যখন পীড়িত, শ্রান্ত, তখন জীবনের সুরটি একবার বাঁধিয়া লইবার জন্য এই ধ্যানের জগতে আসিয়া প্রবেশ করি, তীরের কর্মে গায়ে ধূলা লাগে; সেই ধূলা দূর করিয়া একবার শুচি হইয়া আসিতে হইবে না কি? তাহার জন্য একবার সেই বৃহতের মধ্যে অবগাহন করিতে হইবে না কি? কবি যখন সেই অবগাহনের জন্য প্রস্তুত হন তখন—"এ কোন অশ্রুভরা গীতি ছলছলিয়ে উঠে কানের কাছে বাজে" এবং—

ছায়ানিচোল দিয়ে ঢাকা মরণ ভরা তব
বুকের আলিঙ্গন
আমায় নিল কেড়ে নিল সকল বাধা হতে
কাড়িল মোর মন।

বৃহতের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, অনেক মৃত্যুকে যে স্বীকার করিতে হইবে। অনেক লোভ মোহ, অহংকার দূর করিতে হইবে, যাহা কিছু স্থূল তুচ্ছ আমাদের ঘিরিয়া আছে, সে সকলি দূরে রাখিয়া আসিতে হইবে; 'দিঘি' কবিকে সেই মরণভরা আলিঙ্গন দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু দিঘিতেই কবি থাকিয়া যান নাই; অবগাহনের আনন্দে শুচি হইয়া কবি আবার তীরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বৃহতের ধ্যানে আনন্দময় প্রাপ্তির কথাটি 'প্রভাতে' কবিতায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এখানে সমগ্র কবিতাটির মধ্যেই সাঙ্কেতিকতা পরিস্ফুট, বৃহতের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, যে ক্রন্দন, তাহাতেই কবিচিত্ত বিকশিত হইয়াছে। সেই চিত্ত-বিকাশের আনন্দটি কবি এখানে ব্যক্ত করিয়াছেন। এক রজনীর অশ্রুবর্ষণে

কবির 'ঘরের সরোবর'টি তথা কবির অন্তর্জীবনটি এক অভিনব ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। কবি বৃহতের চেতনায় জাগ্রত হইয়াছেন ;—

নয়ন মেলিয়া দেখিলাম ওই
ঘন নীল জল করে থই থই
কূল কেথা এর তল মেলে কই,
কহ গো মোরে—
এক বরষায় সরোবর দেখো
উঠেছে ভরে।

কবির মনোভূমিতে এখন 'দিঘি'র সৃষ্টি হইয়াছে। কবির সত্তা বিস্তৃত হইয়াছে, চেতনা বিকশিত হইয়াছে, কবি বৃহতের বোধে জাগ্রত হইয়াছেন। কবির শূন্য অন্তরটি পূর্ণ হইয়াছে।

কবি বলিতেছেন ঃ বৃহতের জন্য ক্রন্দনে যখন সমস্ত চিত্তটি ভরিয়া উঠিল, তখন সেই 'অকূল-অশ্রু সলিল মাঝে' এ কাহার আবির্ভাব! সেই বেদনা কাহাকে প্রকাশ করিয়াছে! ক্রন্দন তাহা হইলে ব্যর্থ হয় নাই, জাগরণ তাহা হইলে বৃথা যায় নাই! তাহাতে একটী কিছুর দেখা মিলিয়াছে। তাহা যে কি বুঝাই কেমন করিয়া! সে আমার সকল ক্রন্দনের কারণ, সকল সাধনার সিদ্ধি। তহোকে তো স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারি না, সে তো বস্তু নহে ; সে আমার ধ্যানর ধন, তাহার একটি ভাবদেহ রহিয়াছে ; সে কান্তিস্বরূপ। ভাষায় ধরিতে গেলে বলিব—সে একটি অমল কমল কান্তি ; শ্বেত শতদলের যে মাধুর্য, যে লাবণ্য তাহারই সহিত বুঝি ইহার তুলনা দেওয়া যায়। কবি তাই বলিলেন ঃ

হেরো হেরো মোর আকুল-অশ্রু-
সলিল মাঝে
আজি এ অমল কমল কান্তি
কেমনে রাজে।
একটি মাত্র শ্বেত শতদল
আলোকে পুলকে করে ঢলঢল
কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রু-সাগর
সলিল মাঝে।

এই যে শ্বেত শতদল—ইহাই কবির দুখযামিনীর বুকচেরা ধন; কবির মনোজীবনে ইহাই নবীন প্রভাতের সূচনা করিয়াছে, কবির চেতনার বিকাশ ঘটিয়াছে। এখন কবি বুঝিয়াছেন—

ইহারই লাগিয়া হৃদ্‌বিদারণ
এত ক্রন্দন, এত জাগরণ,
ছুটেছিল ঝড় ইহারই বেদন
বক্ষে লেখি।

'আকাশ' ও 'সমুদ্র' এই রূপক চিত্র দুইটি আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। আমাদের সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের যে সঙ্গীত তাহাকে কবি 'নীড়ের গান' বলিয়াছেন, বৃহতের ভূমিকায় দেখিলে ইহাকে কোটরের মধ্যে কীটের খেলার উসুখুসু শব্দের মতনই মনে হয়। কিন্তু কবি এখন বৃহতের কথা বলিবেন, বৃহৎকে ঘিরিয়া যে আনন্দ-বেদনা তাহারই গান গাহিবেন। এ গান হইল নীল আকাশের নির্জন গান। এ সঙ্গীতের শ্রোতা গায়ক নিজেই; আপনার ধ্যান-জীবনে প্রবেশ করিয়া ইহা আত্মানুভূতির আনন্দ-সঙ্গীত; নীড়ের জীবনে যাহা চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব জাগাইয়াছিল, তাহা হইতে সরিয়া আসিয়া আরও গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে। এই গভীরে প্রবেশ করিয়া জীবনকে আস্বাদন করিবার নানা স্তর রহিয়াছে, আকাশের বিভিন্ন স্তরের সহিত তুলনা দিয়া কবি বিষয়টি প্রকাশ করিয়াছেন। আকাশের দিকে ক্রমঊর্ধ্বায়ন হইল জীবনের গভীর হইতে গভীরতর স্তরে প্রবেশ করা।

গন্ধ বিহীন বায়ুস্তরে
শব্দ বিহীন শূন্য-'পরে
ছায়া বিহীন জ্যোতির মাঝে
সঙ্গি বিহীন নির্মমতায়।

নীড়ের জীবনে যখন একান্ত লিপ্ত থাকি, তখন নানা ভোগ লইয়া থাকি; গভীরে প্রবেশ করিলে ভোগের স্থূলতা কমিতে থাকে। আকাশের গন্ধময় বায়ুস্তরটি পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত, পক্ষবিস্তার করিয়া প্রথমে গন্ধবিহীন বায়ুস্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। আরও গভীরে প্রবেশ করিলে জীবনের সকল তুচ্ছ কলরব শান্ত হইয়া আসে; তখন 'সব কথা, মনে হয় শুধু মুখরতা'। ভোগের স্থূলতা দূর হইলেও চাওয়া-পাওয়ার হিসাব যেন কিছুতে মিটিতেই চায় না,

বাহিরের কলরব শান্ত যদিও হয়, অন্তর কোলাহল করিতে থাকে। সকল কলরব-কোলাহলের উর্ধ্বে ডানা মেলিতে হইবে, যেখানে সবই শুভ্র, সবই জ্যোতির্ময়; যেখানে কোন অহঙ্কারের ছায়া নেই। নীড়ের জীবনে আমরা যে কেবলই সত্যের আলোতে, প্রেমের আলোতে আমাদের স্থূলতায় ছায়া ফেলিতে থাকি। স্থূলতা বর্জন করিতে হইবে, যাহাতে আলোর পথে আমরা বাধা না হইয়া দাঁড়াই। এই যে বৃহত্তর জীবন, এ জীবনে একাকিত্বের সাধনায় তৎপর থাকিতে হয়, যদি ডাক শুনিয়া কেহ সাড়া না দেয়, তবু আপন আনন্দে একাকীই অভিসার করিতে হইবে। সে অভিসার কঠিন, কঠোর নির্মম; তবু বৃহত্তের আনন্দে যে পথ চলিয়াছে, এই সঙ্গিবিহীন নির্মমতাকে আস্বাদন করিবার অভিনব রসিকতাও তাহার মধ্যে জাগ্রত।

'সমুদ্রে' কবিতায় এই অভিসারের কথাই বলা হইয়াছে। কবি স্রোতের মুখে নদীপথে চলিতেছিলেন, তীরের জীবন তাঁহাকে ঘিরিয়া আনন্দ-সম্মোহ রচনা করিয়াছিল; সহসা দেখিলেন, ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন, বস্তুজগৎ হইতে ধ্যানজগতে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে উপনীত হইয়াছেন।—

ঘাটে ঘাটে তীরে তীরে
যে তরী ধায় ধীরে ধীরে
বাইতে হবে নিয়ে তারে
নীল পাথারে একলা-প্রাণে,
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
মুখে আমার রইল চেয়ে,
সিন্ধু-শকুন উড়ে গেল
কূলে আপন কুলায়-পানে।

কিন্তু কবি ভীত হন নাই; নূতন জীবন রসে মাতোয়ারা হইয়া গভীরকে আস্বাদন করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত চেতনাকে জাগাইয়া রাখিয়া বৃহতের ধ্যানটিকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন,—

দুলুক তরী ঢেউয়ের 'পরে
ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ।
গাওরে আজি নিশীথ রাতের
অকূল-পাড়ির আনন্দ গান।

যদি তটের রেখা মুছিয়া যায়, যদি তীরের জীবনের কোন ধ্বনি সেই ধ্যানের জগতে আর প্রবেশ না করে, তবু ক্ষোভ করিবার কিছু নাই, কারণ তাহার চেয়ে বড়ো প্রাপ্তি, গভীর আনন্দ সম্মুখে রহিয়াছে—

দোসর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে
লও রে বুকে দুহাত মেলি
অন্তবিহীন অজানাকে।

কিন্তু তথাপি কবি সমুদ্রে অথবা আকাশে থাকিয়া যান নাই; তীরের জীবনে বা নীড়ের জীবনে কবি ফিরিয়া আসিয়াছেন। 'ঘরেও নহে পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে'—এই মাঝখানে আছেন বলিয়া কবি তীরে বা নীড়ে একান্তভাবে বদ্ধ নহেন, সমুদ্রে বা আকাশেও চিরতরে পাড়ি দেন নাই। নীড় হইতে আকাশে, আকাশ হইতে নীড়ে, তীর হইতে সমুদ্রে, সমুদ্র হইতে তীরে, ঘর হইতে 'দিঘি'তে দিঘি হইতে ঘরে বারবার খেয়া পারাপার করিয়াছেন। যিনি মধ্যগ পথের সাধক, তিনি কোন একটিকে চরম করিয়া না ধরিয়া উভয়ের মধ্যেই পরমকে সন্ধান করিয়াছেন; তাই তাঁহার কেবলই আসা-যাওয়া চলিয়াছে, এই আসা-যাওয়ার জীবনভূমিকেই কবি বলিয়াছেন খেয়া ঘাট। এই খেয়াঘাটেও নীড়-জীবনের কথা আছে কিন্তু তাহাতে আকাশের আলোর সুর লাগিয়াছে, একটা সোনার আভা মিশিয়াছে। বৃহত্তর জীবন-ধ্যানে নীড়ের জীবন কবির কাছে অভিনব রূপ লাভ করিয়াছে। জীবনের হাসিকান্নায় কবি 'নীল আকাশের নির্জন গানে'র উল্লাসটি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা এই প্রসঙ্গে কতকগুলি কবিতার পরিচয় লইয়া খেয়ার আলোচনা শেষ করিব।

( ৩ )

আমাদের এই সাধারণ জীবনের মধ্যেই একটি বৃহত্তর জীবন রহিয়াছে, আমাদের ঘরের পাশেই 'দিঘি' রহিয়াছে, আমাদের নীড়টিকে ঘিরিয়াই একখানি আকাশ রহিয়াছে। জীবনের মধ্যেই আমরা বারবার খেয়া পারাপার করিতেছি। আমরা যখন বৃহতের চেতনায় জাগ্রত হই, জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে আমরা যখন জীবনকে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই, তখন আমাদের সোনার খাঁচার সংকীর্ণ পরিসরটি ছাড়িয়া বাহিরের জগতে পরিব্যাপ্ত হই; তখনই আমাদের জীবনে

একটি খেয়া পারাপার হইয়া যায়। এই খেয়ার মধ্যে সংসারকে ত্যাগ করিবার সন্ন্যাসিতা যেমন নাই, তেমনি মৃত্যুর বোধে গতানুগতিক বৈরাগ্যের কথাও নাই। 'খেয়া' কাব্য তাই নৈষ্কর্ম্যের কাব্য নয়, অনাসক্তির কাব্যও নয়; ইহার মধ্যে বৃহত্তর প্রেম ও বৃহত্তর কর্মের ধ্বনিটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

তুচ্ছ কর্ম হইতে সরিয়া আসিয়া যখন এই বৃহত্তর কর্মের দীক্ষা লই, স্থূল ভোগ হইতে সরিয়া আসিয়া যখন জীবনকে বড়ো করিয়া ভোগ করিতে শিখি, তখনই জীবনে খেয়া পারাপার হই। আমাদের জীবন সাধারণত অনাহত হইয়া থাকে, আমরা আমাদের চারিপাশে একটি অবগুণ্ঠন টানিয়া 'বালিকা বধূ'র মত সংকুচিত হইয়া থাকি। জীবনের বাতায়নটি একটু ফাঁক করিয়া আমরা বাহিরকে গ্রহণ করি, যে-বাহির আমাদের কাছে রূপকথার জগতের মতো মায়ময়, স্বপ্ন দিয়া তৈয়ারী, যে-বাহিরে শুধু চুড়িওয়ালার আনাগোনা আমাদের সামান্য সুখের সামান্য উপকরণগুলি জোগাইবার জন্য। কিন্তু এই অনাহত জীবনেরও খেয়া পারাপারের অবকাশ ঘটে, অনাহত জীবনেও এই খেয়ার, বৃহত্তর কর্মে ব্রতী হওয়ার কথা প্রাসঙ্গিক। ইহার জন্য তুচ্ছ কর্মের কলরব হইতে সরিয়া আসিতে হইবে। এই সরিয়া আসার কথায় এ যেন না মনে করি যে কবি নৈষ্কর্ম্যের কথা বলিতেছেন। তাই কবি যখন দিনের শেষে কাজ-ভাঙানো গানের কথা শুনাইয়াছেন, গোধূলিলগ্নে মিনতি জানাইয়াছেন—'সারা হল কাজ মিছে কেন আজ ডাক মোরে আর কাজে", 'নিরুদ্যম' কবিতায় যখন বলিতেছেন, জীবনে কর্মের আহ্বানে সবাই কত দূরের পথ চলিল, তিনি তাহার মাঝখান হইতে কখন বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন, রৌদ্রেঘেরা সবুজ আরামের মধ্যে আসন পাতিলেন এবং—

মগ্ন হলেম আনন্দময়
অগাধ অগৌরবে—
পাখির গানে, বাঁশির তানে
কম্পিত পল্লবে।—

তখন কবির এই নিরুদ্যম কর্মকে অস্বীকার করিবার জন্য নয়, কর্মের তুচ্ছতাকে অস্বীকার করিয়া বৃহতের ধ্যানে বৃহত্তর কর্মকেই স্বীকার করিবার জন্য। কবি বলেন, কর্মের সংস্কারের জন্যই কর্ম হইতে সরিয়া আসিতে হইবে, বৃহতের ধ্যানে সমাহিত হইতে হইবে। তাহা হইলে বৃহত্তর কর্মের প্রেরণাও

লাভ করিতে পারিব। 'ভার' কবিতায় সেই বৃহত্তর কর্মের বোধটি প্রকাশ পাইয়াছে—

তুমি কাজ দিলে কাজের সঙ্গে
দাও যে অসীম ছুটি,
তোমার আদেশ আবরণ হয়ে
আকাশ লয় না লুটি।
বাসনায় মোরা বিশ্বজগৎ ঢাকি—
তোমাপানে চেয়ে যত করি ভোগ
তত আরো থাকে বাকি।

কবির ধ্যানের মধ্যে কর্ম সংহত হইয়া আছে। সে কর্ম আমাদের নীড়ের জীবনের উস্থুখুস্থু শব্দের মধ্যে হয়তো সব সময় ধরা পড়িবে না। কবি বলিয়াছেন—

বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।

কারণ, তোমরা আজ যে সব কাজের পিছনে ছুটিয়াছ, সে সব আমার কাছে নিরর্থক বলিয়া মনে হইয়াছে,—রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাঙাগড়া এবং দেশ বিদেশে মতের লাগি লড়া—এ সবে আমার আর মন নাই, ইহাদের মধ্যে বৃহতের স্পর্শটি আর নাই। কবি এখন 'সবার বড়ো হৃদয় ভরা' এক হাসি দেখিয়াছেন, সেই হাসি দিয়া তাঁহার অচৈতন্য ঢাকিয়াছেন এবং তাহারই সঙ্গে সুর মিলাইয়া জীবনবীণায় একটি কথাই বাজাইতে চাহিয়াছেন—'ভালোবাসি, হায় রে ভালোবাসি।' বৃহতের এই ধ্যানে কবির এখন একটি মাত্র প্রার্থনা—

আমি সবায় দেখে খুশি হব
অন্তরে।
কিছু বেসুর যেন বাজেনা আর
আমার বীণা যন্তরে।

বীণা যন্ত্রটিকে সুরে বাঁধা—ইহাই তো সবচেয়ে বড়ো কাজ। ইহার জন্য কত চিত্ত-সাধানার প্রয়োজন, কত পথ চলার প্রয়োজন। 'খেয়া' কাব্যে যে কর্মের কথা রহিয়াছে, তাহা হইল বৃহতের প্রেমে জাগ্রত-চিত্তের আনন্দোচ্ছ্বাসিত কর্ম।

খেয়া কাব্যে প্রেমের বোধটিও সেইরূপ। নীড়ের প্রেমজীবনে আকাশের আলোক আসিয়া মিশিয়াছে। নীড়ের জীবনে প্রেমের স্থূল চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব দেখি; প্রেমের বেদনা ক্ষুধার হাহাকারে পর্যবসতি হয়, সেখানে যতটুকু দিই তাহার চেয়ে ঢের বেশি ফিরিয়া পাইতে চাই। কিন্তু প্রেমের যে-দান লোভ করিয়া লাভের প্রত্যাশা করেনা, সে-ই তো শ্রেষ্ঠ দান, সে-ই তো বড়ো প্রেম। শ্রান্ত পথিক তৃষ্ণার জল চাহিয়া আমার জীবনের পথে আসিয়াছিলে, জলের ধারা তোমার করপুটে ঢলিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু ইহার জন্য তো ফিরিয়া পাইবার কিছু নাই। এ প্রেমে যাহা দেয়. তাহাতে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা তো নাই। তাই,—

যখন তুমি শুধালে নাম
পেলেম বড়ো লাজ
তোমার মনে থাকার মতো
করেছি কোন কাজ
তোমায় দিতে পেরেছিলেম
একটু তৃষার জল,
এই কথাটি আমার মনে
রহিল সম্বল।

আমি যে আপনাকে অল্প একটুও নিবেদন করিতে পারিয়াছি, ইহাই তো আমার পরম সৌভাগ্য। এই নিবেদন এই সেবায় যে প্রেম, তাহাই তোমাকে দিলাম, আমার নাম, আমার অহং তাহার সঙ্গে নাই বা রহিল।

প্রেমের চরিত্রটি যেখানে বড়ো প্রেম সেখানে প্রকাশেই চরিতার্থ, সেবায় চরিতার্থ। আমাদের নীড়ের জীবনে এই প্রেমের দীক্ষা তো আমাদের সব সময় হয় না। জীবনের পথে পথে আমরা ভিক্ষা করিরা ফিরি; ভিক্ষা করি যশ, কামনা, অর্থ; ঠিক কোন জিনিসটি যে ভিক্ষা করিবার, কোন জিনিস ভিক্ষা পাইলে ভিক্ষার ঝুলিটি ভরিয়া উঠিবে তাহা তো জানি না। আমরা তাই দীন ভিখারী। তিনি হইলেন রাজ-ভিখারী, যিনি শ্রেষ্ঠ ভিক্ষাটি চাহেন। প্রেম ছাড়া জীবনে ভিক্ষা করিবার আর তো কিছু নাই। কিন্তু আমরা তাঁহা বুঝিতে পারি না। যিনি প্রেমস্বরূপ তিনি স্বয়ং ভিখারী সাজিয়া আমাদিগকে ভিক্ষা করিতে শেখান, আমাদিগকে বৃহত্তর প্রেমে জাগ্রত করান।

কিন্তু রাজাধিরাজ ভিক্ষা করিতে আসিলেও আমরা সেই শুভক্ষণটি বুঝিতে পারি না। সেই ভিক্ষার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সেই শুভক্ষণে আমরা কৃপণ হইয়া থাকি। খেয়াপার হইয়া আমাদের জীবনের সেই কার্পণ্য ঘুচাইতে হইবে—'কৃপণ' কবিতার ইহাই আন্তর-ব্যঞ্জনা।

যে চিত্তের খেয়া হইয়াছে, সে কিন্তু এই শুভক্ষণটিতে ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রেমে কি লাভ হইবে তাহা বড়ো কথা নয়, প্রেমের যে দেখা মিলিবে, প্রেম যে অনুভব করিব ইহাই চরম ও পরম কথা। তাই নয়নের দৃষ্টিকে উদার করিয়া, মধুর সেবার দুইখানি কঙ্কণ হাতে পরিয়া, নূতন ছন্দে কেশ বেশ বিন্যস্ত করিয়া, সমস্ত অন্তরটি করুণায় বিগলিত করিয়া সংসারের বাতায়নের ধারে আসিয়া বসিয়া আছি। প্রাপ্তি কি মিলিবে জানিনা, কিন্তু এই প্রতীক্ষাতেই আনন্দ, প্রেমের সাজে সাজিতেই আনন্দ। কোন এক সময় রাজার দুলাল হয়তো সমুখ দিয়া চলিয়া যাইবে, তখন এই কথাটি যেন প্রকাশ পায়—আমি অপ্রস্তুত নই, তোমার জন্যই আমি আমার সকল আয়োজন সাঙ্গ করিয়া রাখিয়াছি ; এইবার শুধু নিজেকে নিবেদন করিয়া দিতে হইবে। রাজার দুলালকে যে শ্রেষ্ঠ ধন দিয়াছি তাহা কিসে প্রকাশ পাইয়াছে ? প্রকাশ পাইয়াছে আমার বেদনার মধ্যে, আমার জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে। দুঃখের পরিমাণ যত অধিক, আমার আত্মনিবেদন ততই প্রমাণিত। তাইতো বেদনাকে ভয় করি নাই বরং জীবনের খেয়ায় বেদনার তাৎপর্যকে যে বুঝিয়াছি। প্রেমের পথে চলিবার জন্য দুঃখবরণে প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রেমের গভীরে প্রবেশ করিলে ক্ষতিকে যে ক্ষয় বলিয়া মানি না, তখন যে দুঃখকেও আস্বাদন করি, কিংবা দুঃখের রূপেই প্রেম আবির্ভূত হয় বুঝিয়া দুঃখটাকেই আঁকড়িয়া ধরি ; বলি,—'যেখানে ব্যথা সেখানে তোমায় নিবিড় করে ধরিব হে'। যদি অপ্রস্তুত থাকি তবে এই 'দুঃখরাতের রাজা' ঝড়ের ভূমিকায় আবির্ভূত হইবেন। নিদারুণ আঘাত দিয়া তিনি আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লইবেন। আমরা সুখের আশায় পুষ্পমাল্যের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিব, তিনি দুঃখ দিয়া আমাদিগকে কঠোর ব্রতে লিপ্ত করাইবেন, তরবারির সাজে সাজাইয়া দিবেন। এইরূপে বৃহতের স্পর্শে আমরা কর্মে, প্রেমে ও জ্ঞানে জীবনের আরও গভীরে প্রবেশ করিব। খেয়াকাব্যে এই বৃহত্তর জীবনরস-রসিকতাই অভিনব শিল্পভঙ্গি ও গীতমূর্ছনায় নন্দিত, অভিনন্দিত হইয়া উঠিয়াছে।

# পঞ্চম অধ্যায়

## গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি ঃ সহজজীবন

খেয়া কাব্যে কবি রবীন্দ্রনাথ তুচ্ছ হইতে মহতে, প্রেয় হইতে শ্রেয়ে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে খেয়া পারাপারের মধ্যে রসাস্বাদন করিয়াছিলেন এবং শ্বেত-শতদলের মতন অমল কান্তিতে বিকশিত, প্রভাত কিরণের মতন স্নিগ্ধ মাধুর্যে উদ্ভাসিত, ও মৌন সন্ধ্যার মতন করুণ গাম্ভীর্যে রহস্যাবৃত এক অভিনবের আবির্ভাবকে আপনার মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি প্রেমস্বরূপ,—তিনি সকল অপূর্ণতার পূরণ, সকল দুঃখের চরিতার্থতা, সকল বিরোধের অবসান। তাঁহাকে কবি লাভ করেন নাই কিন্তু স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার দেখা পান নাই, কিন্তু তাঁহাকে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্ব বুঝেন নাই, কিন্তু আপনার আনন্দ-বেদনার মধ্যে বারবার তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন। 'সোনার তরী'তে কবি তাঁহার অস্ফুট আহ্বান শুনিয়াছেন, 'চিত্রা'য় তাঁহাকে 'অন্তরতম' বলিয়া বুঝিয়াছেন, 'নৈবেদ্যে' তাঁহারই জন্য জীবনের ডালি সাজাইয়া আনিয়াছেন, 'খেয়া'য় তাঁহাকেই জীবনের নানা উত্তরণের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। কখনও সে অপরিচিতা মেয়ে, কখনও কৌতুকময়ী অন্তর্যামী কখনও মোহিনী স্বামিনী, কখনও বিশ্বরাজ, আবার কখনও অভিনব খেয়ার কাণ্ডারী। এই বিচিত্র রূপে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়া তিনি কবিকে পথ হইতে পথে লইয়া চলিয়াছেন। এই পথ চলার মধ্যে একটি কথাই সর্বত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে—আমাদের দৈন্যে জীবনের সুর বারবার নামিয়া যায়, আমরা

তুচ্ছে রত হই, কলহ করি, কোলাহল করি ; সংসার আমাদিগকে পীড়া দিতে থাকে, আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবনের নামে আমরা মৃত্যু যাপন করি। শ্রেয়ের সাধনায় তথা প্রেমের উপলব্ধিতে জীবনের এই দীনতা আমাদিগকে দূর করিতে হইবে, আমাদিগকে শুচি হইতে হইবে, শুভ্র হইতে হইবে তাহা হইলে সংসারের মধ্যেই আমরা একটি আনন্দময় সহজজীবন যাপন করিতে পারিব।

এই সহজজীবন হইল আমাদেরই এক বৃহত্তর জীবন। ইহার জন্য আমাদের এক গোপন আকাঙ্ক্ষাও রহিয়াছে। আমরা মাঝে মাঝে তাহার আয়োজন করি, বিষাক্ত বাতাসে শ্বাসকষ্টের যে যন্ত্রণা তাহাই আমাদিগকে সেই সহজের দিকে ঠেলিয়া দেয়। মাঝে মাঝে আমরা খেয়া পারাপার হই। কিন্তু আমাদের সুর নামিয়া যায়, বীণার সব কটি তার আমরা বাঁধিয়া লইতে পারি না। সুরের সাধনা করিতে বসি, কিন্তু পর মুহূর্তে দেখি তুচ্ছে রত হইয়াছি, অল্পকে লইয়া কলহ-কোলাহলের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছি। তাই সুর যাহাতে নামিয়া না যায়, তাহার জন্য আমাদের এই সংসারের মধ্যেই একটি প্রণামের আসন পাতিয়া লই। প্রণাম করিবার এই আসনটি তো ছোট নয়। জীবনকে সংকীর্ণ করিলে আসনটি তো সেখানে ধরে না। আসনখানি বড়ো হওয়া চাই, কারণ সকল দিক হইতেই যে প্রণত হইতে হইবে। সকাল বেলায় প্রভাত সূর্যের আলোয় আমার প্রণামের অর্ঘ্য আনিব, গোধূলিবেলায় ঘাটের বিজন পথটিতে আমার নিভৃত প্রণামটি রাখিয়া আসিব, আরতির সন্ধ্যাদীপমুখে আমার প্রণামখানি জ্বলিয়া উঠিবে, নিশীথের জ্যোতিষ্কগুলি আমারই প্রণামের স্পর্শে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিবে। প্রণাম আমার নীল আকাশের আসনে, প্রণাম আমার দিঘির পাড়ে সবুজ তৃণের শয্যায়, প্রণাম আমার ঢেউ তোলানো হঠাৎ-আসা বাতাসে, প্রণাম আমার গাছের শাখার দোলনে। বীণা যেখানেই বেসুরে বাজিয়া উঠিতেছে, সেইখানেই প্রণামের বাঁধন ; ভোগের বিষয়কে দুই হাতে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছি, তাহাকে ছাড়িয়া দুই রিক্ত কর যুক্ত করিয়া প্রণাম, অহংকারে মাথা উঁচু করিয়া আছি, অহংকার দূর করিয়া নত হইবার জন্য প্রণাম, আপনাকে একান্ত করিয়া তুলিয়াছি, বিশ্বকে স্বীকার করিবার জন্য প্রণাম, নানা জটিলতার মধ্যে বিকার-গ্রস্ত হইয়া আছি, বিকারের উর্ধ্বে উঠিয়া সহজ হইবার জন্য প্রণাম।

'খেয়া' কাব্যের সাধনজীবনের পর গীতাঞ্জলিতে সহজজীবনের উপলব্ধিতে এই প্রণামের আয়োজনটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যে বৃহতের চেতনায়

এই প্রণামের আয়োজন, সেই বৃহতের বার্তা 'সোনার তরী' কাব্য হইতে বিচিত্র শিল্পভঙ্গির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' এবং 'গীতালি' এই ত্রয়ী কাব্যের মধ্যে তাহাই জীবনে সহজ হইয়া উঠায় সেই একই জীবন-বাণীর নূতন শিল্পরূপ দেখি। তাহাদের মধ্যে সুর দেখিতে পাই। কিন্তু এই ত্রয়ী কাব্য সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত হইলেও রবীন্দ্রদর্শনের ভূমিকায় দেখিলে এগুলিকে রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের মূলধারার সহিত যুক্ত বলিয়াই আমরা দেখিতে পাইব এবং ত্রয়ীকাব্যের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য আমাদের নিকট ধরা পড়িবে।

সহজ জীবনের উপলব্ধিতে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির গানগুলি সুরগর্ভ কবিতা। বাণীর বাহিরের মূর্তিতে নাই, বাণীর ভিতরে অকথিত বাণীরূপে যাহা অন্তর্লীন হইয়া আছে তাহাকেই বলি বাণীর সুর। তাহা বাণীর ভিতরের বাণী। ইহার আক্ষরিক রূপ নাই, ইহার একটি ভাব, দেহ রহিয়াছে। আলঙ্কারিকেরা ইহাকে ধ্বনি বলিয়াছেন। এই ধ্বনি বা আন্তর-বাণী কথাকে আশ্রয় করিয়াই কথাকে অতিক্রম করিয়া যায়। নির্দিষ্ট হইতে অনির্দিষ্টের দিকে ইহার গতি।

কাব্যের বাণী যখন এই আন্তর-বাণীতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে অর্থাৎ কাব্যের বাণী যখন সুরগর্ভ হয়, তখন রাগরাগিণীর নানা সুর তাহার সঙ্গী হইয়া আসে। বিস্তৃতি ও গভীরতার দিক দিয়া বাণীর ধ্বনির সঙ্গে রাগরাগিণীর সুরের একটা সমধর্মিতা আছে। অন্ততঃপক্ষে রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে এই সমধর্মিতার সূত্রটি কী, তাহা আমরা রাগরাগিণীর সুর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারি: "আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সামঞ্জস্যময় নয়—তার কোনো তুচ্ছ অংশ হয়তো অপরিমিত বড়ো, ক্ষুধা তৃষ্ণা ঝগড়া-ঝাটি আরামব্যারাম টুকিটাকি খুটিনাটি এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তকে কণ্টকিত করে তুলছে—কিন্তু সংগীত তার ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা সমস্ত সংসারটিকে এমন এক পার্সপেক্‌টিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো চোখে পড়ে না—একটা সমগ্র, একটা বৃহৎ একটা নিত্য সামঞ্জস্যদ্বারা সমস্ত পৃথিবী ছবির মতো হয়ে আছে এবং মানুষের জন্ম-মৃত্যু হাসিকান্না ভূতভবিষ্যৎ বর্তমানের পর্যায় একটি কবিতার সকরুণ ছন্দের মতো কাণে বাজে—সেই সঙ্গে আমাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রবলতা তীব্রতার হ্রাস হয়ে আমরা অনেকটা লঘু হয়ে

যাই এবং একটি সংগীতময়ী বিস্তীর্ণতার মধ্যে অতি সহজে আত্মবিসর্জন করে দিই।”

রবীন্দ্রনাথের জীবনবাণীতেও এই বিশেষ পার্সপেক্‌টিভের কথা আছে, বৃহত্তর জীবনবোধে চিত্ত জাগরণের কথা আছে। রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর জীবনবাদ যখন কবি-স্বভাবে সহজ হইয়া উঠিয়াছ তখন তাহা কাব্যের আন্তরবাণীকে আশ্রয় করিয়াছে এবং তখন রাগরাগিণী সহজেই তাহার সঙ্গী হইয়া আসিয়াছে। শিল্পসৃষ্টিতে তখন বাণীর সঙ্গে সুর শিল্পেরই আর একটি উপকরণ মাত্র। ‘সোনারতরী’ ‘চিত্রা’ প্রভৃতি কাব্যে বাণীর বিন্যাসে যে শিল্পমূর্তি কবি সৃজন করিতেছিলেন, এখানে এই ত্রয়ী কাব্যে বাণীর স্থলে সুর আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছে। তাই এক্ষেত্রে অল্পভাষণের মধ্যেই কবি তাঁহার অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়াছেন, সুর আসিয়া অতিরিক্ত বাক্‌বিন্যাসের অবকাশটি অধিকার করিয়াছে। কিন্তু ভাষণ এখানে অল্প হইলেও ইহা গভীর ভাষণ। বাণী এখানে বাণীর ভিতরের বাণীকে, তথা ধ্বনিকে প্রকাশ করিতেছে, তাই ভাষণ এখানে সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহার মধ্যে আমরা একটি ভাবের আকাশ দেখিতে পাই।

বাণীকে সুরগর্ভ করিতে অসামান্য শিল্প-প্রতিভার প্রয়োজন। অথচ কবিতার সুরমূর্তির অন্তরালে শিল্প-প্রয়াসটি এমনভাবে আত্মগোপন করিয়া আছে যে, শব্দ-চয়ন উপমা-প্রয়োগ ও বাণী-বিন্যাসের নৈপুণ্য পৃথক ভাবে চোখে পড়ে না। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ বলেন,—“যে রচনাটি সর্বাঙ্গ সুন্দর তার মধ্যে রচনার কলকৌশল ধরা যায় না—কথা সে যেন ভারি সহজে বলা হয়ে যায় সেখানে।” গীতাঞ্জলির পর্যায়ে মহৎ কাব্যের এই ধর্মটি আমরা দেখিতে পাই। যে বৃহত্তর জীবন কবি রবীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রেরণা, তাহার মধ্যেও এমন একটা ব্যাপ্তি ও গভীরতা রহিয়াছে। তাহাকে বাহির হইতে চরম করিয়া প্রকাশ করা যায় না, আন্তর বাণীই তাহার যোগ্য বাহন। তাই রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহে স্বাভাবিকভাবেই এই-আন্তরবাণীময় সুরধর্মী কবিতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির কবিতাগুলিকে শুধুমাত্র সঙ্গীতরূপে দেখিলে সে সঙ্গীতের রসাস্বাদনে সুরজ্ঞান ও শ্রুতির সংস্কারের উপর নির্ভর করিলেই চলিত। কিন্তু যে বৃহত্তর জীবন-চেতনা এই কবিতাগুলির ধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া আছে, আমাদের মধ্যে অনুরূপ চেতনা জাগ্রত না হইলে গানগুলির পরিপূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভব নয়। বৃহতের যে ধ্যান আমাদের চেতনায় সুপ্ত

রহিয়াছে, গীতাঞ্জলি কাব্যের ধ্বনি আমাদের সেই ধ্যানকে স্পর্শ করে। সেই ধ্বনিকে অনুসরণ করিয়া আমাদের অন্তর সৃষ্টি করিতে থাকে। কবির কবিতা হইতে ভাবনা আহরণ করিয়া আমরাও আপন মনে বাণীহীন কবিতা রচনা করিতে থাকি; এই রচনায় আমাদের সত্তা বিস্তৃত হয়, চেতনা জাগ্রত হয়—সেই জাগ্রত চেতনা বৃহত্তর জীবনের স্বপ্নানন্দে বিলাস করিতে থাকে। গীতাঞ্জলি কাব্যের আবেদন তাই বৃহতের চেতনায় উদ্বেজিত এক সৃষ্টিশীল মনের কাছে। বৃহত্তর জীবনবোধের অভাবে এই সৃষ্টি ক্ষমতার অভাব ঘটিলে আমরা গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির রসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত হইব বলিয়াই আমাদের ধারণা।

রবীন্দ্র-দর্শন ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকায় না দেখিয়া যাঁহারা এই ত্রয়ী কাব্যকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত-প্রবাহের মধ্যে রাখিয়া ইহাদের পরিচয় গ্রহণ করিয়াছেন. তাঁহারা এগুলিকে মোটামুটি 'ধর্ম-সঙ্গীত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয় রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের গানগুলির সহিত তুলনা করিয়া বলেন, "জনসাধারণের কাছে এই অল্প বয়সের গানগুলি ভাল লাগে কেন? বিশেষ করে বলতে পারি যে, আমাদের জীবনে এই সব গানের ভাব ভাষা ও সুর মিশে আমাদের মনে যত সহজে ধাক্কা দেয়, তেমন সহজে পরবর্তী জীবনের গানগুলি মনে জায়গা পায় না। তার জন্যে নিজেকে তৈরী করার প্রয়োজন হয়, সেগুলি সংস্কৃতিমান মনের খোরাক।"

"সংস্কৃতিমান মন" বলিতে শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় কি বুঝাইয়াছেন, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা না করিলেও রবীন্দ্র-দর্শনের দিক হইতে দেখিলে তাহা যে বৃহত্তর জীবনবোধে বিকশিত চিত্তকেই বুঝায় তাহা আমরা মানিয়া লইতে পারি। তাই শুধুমাত্র 'ধর্মসঙ্গীত' আখ্যা না দিয়া রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের মূলধারার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করিয়াই এই ত্রয়ীকাব্যের পরিচয় লইতে হইবে। "রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা" গ্রন্থে শ্রীশুভ গুহ ঠাকুরতা বলেন,—"সঙ্গীতের কাব্যাংশকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ রাগরাগিণীর উপাদানগুলি গ্রহণ করেছেন মাত্র অলঙ্করণের আতিশয্যকে এই একই কারণে তিনি গ্রহণ করেন নি।" এই সকল উক্তি হইতেই প্রতীয়মান হয় যে রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের সহিত যুক্ত করিয়া না দেখিলে গীতাঞ্জলি-গীতিমালী-গীতালি হইতে সম্যক্ রসাস্বাদন আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহে 'গীতাঞ্জলি-পর্ব' হইল আর একটি নূতন অধ্যায় যেখানে বাণী ও সুর একই আধারে বিধৃত হইয়াছে। বাণী লাভ করিয়াছে সুরের বিস্তার সুর লাভ করিয়াছে বাণীর বন্ধন। বাণী ও সুরের এই মিলনকে রবীন্দ্রনাথ 'অর্দ্ধনারীশ্বররূপ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন—"সংসারে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে, বাংলা সঙ্গীতে তাহা হওয়া চাই। এই মিলন সাধনে ধ্রুব পদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে,—আর অনিন্দনীয় কাব্য মহিমা তাকে দীপ্তিশালী করবে।"

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের গানে এই ধ্রুবপদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয় বিশেষ গবেষণামূলক আলোচনা করিয়া বিদগ্ধসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার আলোচনা অনুসরণ করিয়া হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ কতখানি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি ; কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সুরের সাহায্যে বাণীর বন্ধন অতিক্রম করিয়া যে নৈর্ব্যক্তিক ভাবনার মধ্যে প্রয়াণের কথা রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ কেন সে পথে যাইতে চাহিলেন না তাহা বুঝিয়া দেখিতে হয়। এ প্রশ্ন উঠিলেই কবি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিকারের দিকটি নির্দেশ করিয়াছেন, 'তানসেনী' বলিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন ; কিন্তু তানসেন-সঙ্গীতের স্বরূপকে স্বয়ং অনুসরণ না করিয়া ভিন্ন ধারায় পথ চলিবার কথাই তাঁহাকে বলিতে দেখি।

আপনার সঙ্গীতের আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তরুণবয়সের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"গায়কেরা সঙ্গীতকে যে আসন দেন, আমি সঙ্গীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই ; তাঁহারা সঙ্গীতকে কতকগুলি চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাঁহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি, তাঁহারা গানের কথার উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই।"

সংগীত যেখানে বাণীকে অস্বীকার করিয়া নৈর্ব্যক্তিক রূপ-কল্পনার দিকে গিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেখানে সঙ্গীতকে চেতনাহীন জড় সুরের সমষ্টি মাত্র বলিয়াছেন এবং অমরভাব বলিতে বোধ করি কাব্যান্তর্গত ধ্বনিকেই বুঝিয়াছেন। ভারতীয় 'ক্লাসিক্যাল' সঙ্গীত তাই যে অর্থে abstract রবীন্দ্রসঙ্গীত সে অর্থে abstract নয়। রবীন্দ্রসংগীত একটি বৃহত্তর জীবন-বাণীকেই সুরমূর্তি দান করিয়াছে। সুর তাই ভাবের বন্ধন হইতে পলায়ন করে নাই। 'ভাবের বন্ধন'

বলিলাম এই জন্য যে, সঙ্গীতের মুক্তি বলিতে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের তান-লয়ের অত্যাচার হইতে মুক্তি বুঝিয়াছেন এবং সে মুক্তিতে সঙ্গীত এক বৃহত্তর ভাব-পরিমণ্ডলের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। এই ভাবের মধ্যে মুক্তির জন্যই সঙ্গীতকে বাণীর বন্ধন স্বীকার করতে হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাই শব্দোচ্চারণে ও শ্বাস-গ্রহণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে, বোলতানে শব্দের ভাবদেহটি বিনষ্ট হয় বলিয়া রবীন্দ্র সংগীতে বোলতান নিষিদ্ধ।

সঙ্গীতের আদর্শ বলিতে রবীন্দ্রনাথ তাই সুর ও বাণীর সাহায্যে একটি বৃহত্তর জীবন-ভূমিতে চিত্ত জাগরণের কথাই বলিয়াছেন। ভারতীয় রাগপ্রধান সঙ্গীত বাণীকে অতিক্রম করিয়া নৈর্ব্যক্তিক রাজ্যের দিকে প্রসারিত, রবীন্দ্রনাথ সুর-সাধনায় সেই নৈর্ব্যক্তিকতাকে স্বীকার করেন নাই। সীমাকে, রূপকে অস্বীকার করিয়া জীবন হইতে রবীন্দ্রনাথ যেমন পলায়ন করিতে চাহেন নাই, সীমার মধ্যে অসীমকে, রূপের মধ্যে অরূপকে আস্বাদনের কথাই যেমন রবীন্দ্র-দর্শনের মর্মবাণী, তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সুরসাধনায় এক বৃহত্তর জীবন আস্বাদনের কথাই রবীন্দ্রনাথ বলেন ; সুরের পথে বাণীর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নৈর্ব্যক্তিক রূপকল্পনার আনন্দে সমাহিত হইবার সাধনাকে কবি স্বীকার করেন না।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের আদর্শ হইতেই আমরা বুঝি যে, গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালীর কবিতাগুলি সঙ্গীত হইলেও সেগুলিকে রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহের মধ্যে রাখিয়া দেখিবার অবকাশ আছে। সেদিক দিয়া তিনটি কাব্যের মধ্যে আমরা সুরের ও ভঙ্গির পার্থক্য দেখিতে পাইব।

গীতাঞ্জলিতে কবি সংসারের মধ্যে দাঁড়াইয়া গানের অঞ্জলি দিয়াছেন। কবির গানে তাই সংসারের হাসিকান্নার ধ্বনি রহিয়া গিয়াছে। খেয়া-পারাপারের আনন্দে কবি বৃহতে তৃষিত হইয়াছেন, কিন্তু নীড়ের ক্রন্দনও কবির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। জীবনেব যে সূক্ষ্ম তারটিতে বৃহতের সুর বাজিয়া উঠে, তাহার সহিত সংসারের মোটা তারটি জড়াইয়া গিয়াছে। কবি গানের আয়োজন করিয়াছেন, কিন্তু—

এই বেসুরো জটিলতায়
পরাণ আমার মরে ব্যথায়
হঠাৎ আমার গান থেমে যায়
বারে বারে।

ইতিপূর্বে 'চিত্রায়' 'ছিন্নতন্ত্রী-বীণা' জীবনদেবতার পায়ের কাছে সঁপিয়া দিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দেবী যদি কোলে তুলিয়া লন, তাহা হইলে তাঁহার দিব্য শ্রবণে এই ছিন্নতন্ত্রী-বীণাও সার্থক হইয়া উঠিবে। এখন কিন্তু গানের আয়োজনে প্রণামই শেষ কথা', অঞ্জলি দানই লক্ষ্য। তাই সভার পথে আসিয়া কবি লজ্জা পাইয়াছেন, অন্য কোন মিনতি জানাইতে সঙ্কোচ হইতেছে। সঙ্কোচের কারণ রহিয়াছে; জীবনকে কবি স্বীকার করিয়াছেন, ভালবাসিয়াছেন; এই জীবন মাঝে মাঝে কবির ধ্যানের ধনকে ঢাকিয়া ফেলে। সে জন্য জীবনকে কবি গালি দেন, কিন্তু সংসারকে ফেলিতে পারেন না—

তোমারে আবরিয়া ধূলিতে ঢাকে হিয়া
মরণ আনে রাশি রাশি
আমি যে প্রাণভরি তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালবাসি।

সংসার কবিকে কতকগুলি মধুর মৃত্যু দিয়াছে, কতকগুলি করুণ বন্ধন দিয়াছে, খাঁচার কতকগুলি স্বর্ণ দণ্ড দিয়াছে। বৃহতের প্রেম-সাধনায় অনেক সময় সেগুলি বাধা হইয়া উঠে, তখন সেগুলি সরাইতে গেলে কবি ব্যথা পান। জীবন ভার হইয়া উঠে, তবু বোঝা নামাইতে পারেন না। কবির ঘরে এখনও অনেক ভাঙাচোরা জড় হইয়া আছে।

আমাদের এই ভাঙা-চোরা সংসারের মধ্যেই দাঁড়াইয়া আছেন বলিয়া কবির গীতাঞ্জলিতে আমাদেরই পরিচিত ভাষা রহিয়াছে। আমাদেরই সুখ দুঃখের কথা একটি প্রণামকে ঘিরিয়া লীলায়িত হইয়াছে। বৃথা অহঙ্কারে আপনাকে লইয়া ঘুরিয়া মরিতেছি, অহঙ্কার দূর করিয়া প্রণত হইতে হইবে, জীবনে দুঃখকে বরণ, করিবার জন্য আরও প্রস্তুত হইতে হইবে, তাই প্রভু, তুমি আমাকে আঘাত দিয়া ভালই করিয়াছ—আমার এ চিত্ত ধূপ বেদনায় যত দগ্ধ হয়, আমি ততই দুঃখের দীক্ষায় বিকশিত হই, দীন আমি, ভোগী আমি, কেবলই স্থূলে লিপ্ত হই, আমার বাসনা যাহাকেই স্পর্শ করে তাহারই আলো ম্লান হইয়া যায়, এইবার তাই একটি কথা বলিতে দাও—

সেই অশুচি, দুই হাতে তার
যা এনেছে চাইনে সে আর
তোমার প্রেমে বাজবে না যা
সে আর আমি সইব না।

এবার যেন 'বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি' নিঃশেষে খালি হয়, এবার যেন আমার সকল ভালবাসা তোমরই দিকে অভিসার করে।

বৃহতের প্রেমকাঙ্ক্ষায় নীড়ের ক্রন্দন মিশিয়াছে, আমাদের পরিচিত ভাষাই আমরা এখানে তাই পাইয়াছি। গীতাঞ্জলির গানগুলি তাই আমাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমাদের সহজ সংস্কারকেই তাহা স্পর্শ করে; তখন আমরা আমাদের পরিচিত পথেই ধ্বনির ভিতরে প্রবেশাধিকার পাই। কাব্যের বহিরঙ্গে আমাদের পরিচিত জগতকে দেখি, দেখি আমাদেরই সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলিকে। সেই পরিচিত উপকরণগুলি পাইয়া আমাদের পক্ষে ভাবের আকাশটি সৃষ্টি করা সহজ হয়।

গীতাঞ্জলির কতকগুলি গানে অরূপের আস্বাদনে মানবজীবনের চিত্রের পরিবর্তে প্রকৃতির চিত্র দেখিতে পাই। কিন্তু তাহাতেও একথা যেন মনে না করি যে, কবি জীবন হইতে সরিয়া গেলেন। বৃহত্তর জীবনের কথাতে আমরা অনুরূপ প্রকৃতির চিত্র দেখিতে পাই। বৃহত্তর জীবন-চেতনায় প্রকৃতি মানব সত্তারই মত আর একটি আনন্দময় সত্তা। যে বোধে মানুষকে বড়ো করিয়া দেখি সেই বোধেই প্রকৃতিকেও সুন্দর বলিয়া জানি। অরূপের আস্বাদনে প্রকৃতির যে আনন্দময় পরিবেশ পাই, তাহাতে কবি মানসে সেই একই বোধের ইঙ্গিত দেয়। অরূপের আস্বাদন তাই রবীন্দ্র-চেতনায় সংসারের অতীত কোন বিষয় নহে, তাহা বৃহত্তর জীবন-বোধেরই উন্মেষ, তাহা একান্ত ভাবেই মানবিক। তাই কবি যখন বলেন,—

লেগেছে অমল ধবল পালেতে
মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।

তখন এই চিত্রের পিছনে ভালো-মন্দ, হাসি, অশ্রুতে মেশা মানব জীবনের আনন্দ-চেতনাটি উঁকি মারিয়াছে—

পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।

বৃহত্তর জীবন-বোধই গীতাঞ্জলিতে প্রকৃতির আনন্দময় পরিবেশ রচনা করিয়া দিয়াছে।

গীতাঞ্জলিতে প্রেমের ধ্যান ও ধারণায় মানবতার রূপটি তাই সুস্পষ্ট। এখানে কবি আমাদের সংসারের আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন। অরূপরতনের আশায় কবি এই রূপ সাগরেই ডুব দিয়েছেন, এই সীমার মধ্যেই অসীমের সুর শুনিয়াছেন, বিশ্বরূপের খেলাঘরে অরূপকে বার বার স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন।

( ২ )

'গীতাঞ্জলির' পর 'গীতিমাল্যে' কবির মানসিকতায় সূক্ষ্ম স্তর ভেদ দেখিতে পাই। 'গীতাঞ্জলি'তে কবি সংসারের মধ্যে দাঁড়াইয়া গান ধরিয়াছিলেন, এখন সেই গান গাহিয়া অন্তরের গহন পথে প্রণত হইয়া চলিতে চলিতে কবি মনোভূমিতে এমন একস্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন, যেখানে একদিকে এই সংসার-চেতনা এবং আর একদিকে এই সংসারের অতীত বৃহতের আনন্দলোক। এখানে একদিকে কবির হাসিকান্নায় জড়ানো জীবনবোধ, আর একদিকে কবির হাসিকান্নার ঊর্ধ্বে বৃহতের রহস্য-লোক। প্রণামের পথ ধরিয়া কবি এইবার মনোজীবনের এই একটি সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।—

রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় হল দেখা
সেই মোহানার ধারে।

প্রণাম করিতে করিতে মানস-সরোবর-যাত্রী হংসের মতন কবি প্রেমের পথে চলিতেছিলেন। কবি তখন প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

নানা সুরের আকুলধারা
মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক
নীরব পারাবারে।

এখন সেই নীরব পারাবারের সামনে আসিয়া কবি দেখিলেন—

সেইখানেতে সাদায় কালোয়
মিলে গেছে আঁধার আলোয়
সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে
এপারে ঐপারে।

কবি যেন আর এক নূতন খেয়ার জগতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এ খেয়ার রূপটি আরও সূক্ষ্ম। 'খেয়া'-কাব্যে খেয়া হইয়াছিল এক কর্ম হইতে আর এক কর্মে, এক প্রেম হইতে আর এক প্রেমে, এক জ্ঞান হইতে আর এক জ্ঞানে; অর্থাৎ সংকীর্ণ সংসার হইতে বৃহত্তর বাস্তবে। এখন খেয়া হইল মনের গভীর হইতে গভীরে খেয়া, ইহা হইল সঙ্গীতের খেয়া। গান গাহিতে গাহিতে কবি উপলব্ধির এমন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, যেখানে আর অগ্রসর হইলে নীরবতার রাজ্য; যেখানকার কথা আর লোকায়ত সুরে বলা যায় না, বলিতে গেলে তাহার রূপটি আর আমাদের গতানুগতিক রস-সংস্কারে ধরিতে পারি না। এখন কবির গানের পালে হাওয়া লাগিয়াছে, এখন উদারা হইতে মুদারায় খেয়া। এখানেও একটি আলো আঁধারের জগৎ রচিত হইয়াছে। কিন্তু খেয়া কাব্যের গোধূলিলগ্নের মত যেন এ গোধূলি নয়। সেখানে বস্তুজীবনের ব্যস্ততা কমিয়াছে, তাহারই জন্য দিনের আলোটি ম্লান। কিন্তু এখন যে আলো আঁধারি অবস্থা তাহাকে ঠিক পূর্বের রূপকটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা চলে না। যদি গোধূলিই বলিতে হয়, তাহা হইলে সে যেন এ জগতের গোধূলি নয়। এ গোধূলিতে তাই জলভরণের পরিবেশ নাই, ঘাটের পথের আহ্বানটি নাই, জলভরা কলসীর কলকথা নাই। খেয়াকাব্যের গোধূলি নদী-পারের, দিঘির বুকের গোধূলি। সেখানে—

দিনের শেষের শেষ আলোটি পড়েছে এই পারে
জলের কিনারায়
পথ চলতে বধূ যেমন নয়নরাঙা করে
বাপের ঘরে চায়।

এই গোধূলির মধ্যে তাই নীড়-জীবনের একটি করুণ মাধুর্য রহিয়াছে; পড়ন্ত রৌদ্রের আলোয় আমারই সংসার এক অপূর্ব স্বপ্নময় মূর্তি লাভ করিয়াছে। আমার চারদিকে ক্রমে ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে,

নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছি এবং আমাকে ঘিরিয়া আমারই পরিচিত সংসারটি শান্ত স্তব্ধ হইয়া আছে।

গীতিমাল্যের গোধূলি সমুদ্রপারের গোধূলি। এ গোধূলি সংসারের সেই পরিচিত গোধূলি নয়। গানের পথটি ধরিয়া জীবনের গভীরে অনুসন্ধান করিতে করিতে কবি যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন সেখানে একদিকে সংসারের বেলাভূমি অন্যদিকে সংসারের অতীত বিরাটের রহস্যরাজ্য। এ গোধূলি তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের গোধূলি এবং এই গোধূলিতে কবি চিত্তের আর এক অভিনব খেয়া পারাপার চলিতেছে। স্থানটি সরু রেখার মত ; আলোর সহিত ছায়া আসিয়া যে রেখায় মেশে সেইরূপ একটি রেখার উপর কবি-চিত্ত স্থিতি লাভ করিয়াছে। সেই রেখার একদিকে সংসার চেতনায় জীবন-সঙ্গীতের বাণীগুলি জাগিয়া উঠে আর একদিকে বৃহতের স্পর্শ লাগিয়া তাহাতে নূতন সুর জাগে। সেই নিতল নীল নীরব মাঝে যে গভীর বাণী প্রকাশিত হয়, কবি কোন সুর সাধনায় তাহাকে প্রকাশ করিবেন ? উদারা হইতে মুদারায় কবি বারবার তাই সঙ্গীতের খেয়া পারাপার করিতেছেন।—

এই আসা যাওয়ার খেয়ার কূলে
আমার বাড়ী
কেউ বা আসে এপারে, কেউ,
পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি।

এবং,—

সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী
দুই পারের এই কানাকানি
তাই শুনে যে উদাস হিয়া
চায়রে যেতে বাসা ছাড়ি।

কবি চেতনায় এ পারে আছে বাণী, ওপারে আছে সুর ; এই বাণীর সঙ্গে সুর মিলাইয়া কবি এখন যে মালাখানি রচনা করিলেন, সেই গীতিমাল্যটি কবি তাঁহার প্রভুর গলায় পরাইয়া দিতে চান, তখন—

মুখের পানে তাকাতে চাই
দেখি দেখি দেখিতে না পাই
স্বপন সাথে জড়িয়ে জাগা
কাঁদি আকুল ধারে।

বোধের এই জগৎটি যেমন আলো-আঁধারি, স্বপনে জাগরণে মেশা একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা, কবির সঙ্গীতও এখন তেমনি অস্ফুট ভাষায়।—

কোলাহল তো বারণ হ'ল
এবার কথা কাণে কাণে
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবল মাত্র গানে গানে।

এখন চুপি চুপি প্রাণের কথাটি বলিতে হইবে। মুখটি সমস্তটা দেখিতে পাই না এখনও সুরের খেলা দূরের খেলা চলিতেছে। আমি পাই নাই, তবু আমার সুরগুলি তো তোমার চরণ পাইয়াছে—'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।' বেলাভূমির শেষ কিনারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, আমি আর ভিতরে যাইতে পারি না, আমার গানগুলি সুরের পাল তুলিয়া চলিয়া যায়, যেখানে প্রাণে প্রাণে আর ধরিতে পারি না সেখানে গানে গানে যেন ধরিয়া ফেলি।

গানে গানে পাই কেমন করিয়া? সে পাওয়া কেমন পাওয়া? সে পাওয়া হাতে পাওয়া নয়, সে অধিকার করা নয়; সে শুধু স্বীকার করা, সে শুধু বুঝিয়া উঠা, সে শুধু অনুভবের মধ্যে সমস্ত সত্তার সঞ্চারিত হইয়া যাওয়া বা হারাইয়া যাওয়া।

সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া
সেই তো দেখা, সেই তো পাওয়া—

সংসারের মধ্যে বৃহতের প্রেমে জাগ্রত হইয়াছি; বিকশিত চেতনায় বিশ্বের আনন্দরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে, সেই আনন্দে আনন্দিত হইয়া প্রেমকে একবার দুই হাতে স্পর্শ করিতে চাই, আকাশভরা উল্লাসখানি গায়ে মাখিয়া লইতে সাধ যায়; সেই আনন্দে উল্লাসে কিছু একটা প্রাপ্তির ইঙ্গিত গানের সুরের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। আমি এপারের মানব, আমার মধ্যে সে প্রাপ্তি দেখিতে পাইবে না, কিন্তু গানের খেয়ায় ভাবের মোহে আমি হয়তো ওপারে ঘুরিয়া আসিয়াছি, আমার গানের সুরগুলিকে অনুসরণ করিয়া সেই প্রাপ্তির সন্ধান করিও।

গীতিমাল্যের গানগুলি তাই ওপারের দিকে, তথা কবির আপনাকে হারাইয়া ফেলা একটা জগতের দিকে, তথা বৃহতের প্রেমোপলব্ধির রহস্যলোকের দিকে প্রসারিত। জীবনের রূপ-চিত্র নহে, সামান্য কতকগুলি কথা এমন অভিনব

গীতমূর্তি লাভ করিয়াছে যে, কথাগুলিকে ধরিতে গেলে ক্রমশঃ আমাদের গতানুগতিক শব্দার্থের সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া এমন এক অর্থান্তরে উপস্থিত হই, যে অর্থ আভিধানিক নয়, যে অর্থ সেই শব্দগুলির মধ্যে হয়তো ছিল না, যে অর্থ আমরা আমাদেরই ধ্যানের আনন্দে সৃষ্টি করিয়াছি। তখন কবিও হয়তো এমনই ধ্যান করিয়াছিলেন, একথা ছাড়া অন্য কথা বলিবার অবকাশ থাকে না। গীতাঞ্জলিতে কবি সংসারের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া গান গাহিয়াছিলেন তাই আমাদের পরিচিত ভাষাই সেখানে দেখিতে পাই, সে বাণীকে অনুসরণ করা আমাদের সহজ হয়। কিন্তু গীতিমাল্যে কবি বোধের যে গভীরে প্রবেশ করিয়াছেন সেখানে প্রবেশ করিতে গেলে আর একটি খেয়াপারের অবকাশ রহিয়াছে। গীতিমাল্যের ভাষায় তাই গীতাঞ্জলির পরিবেশটি নাই, এখানে বাণীর মধ্যে বৃহত্তর জীবনবোধের একটি গভীর স্পন্দন রহিয়াছে, এখানে গানের পালে হাওয়া লাগিয়াছে, এবং নীরবপারাবারের দিকে সকল অর্থ ভাসিয়া চলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা গীতিমাল্যের ২৭ সংখ্যক কবিতাটি আলোচনা করিয়া দেখিব। কবি বলিতেছেন—

আজিকে এই সকাল বেলাতে
বসে আছি আমার প্রাণের
সুরটি মেলাতে।

চিত্ত যখন বিক্ষুব্ধ, জীবন যখন বেসুরে বাজিতে থাকে, তখন এই সুর মিলাইবার কথাটি আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। কিন্তু সুর মিলাইতে বসিয়া অখণ্ড সুরের উপলব্ধিতে যে আনন্দ জাগে তাহাকে বুঝিব কেমন করিয়া ? বাহিরে যে সুরের ছড়াছড়ি, সেখানে যে কেবলই সুরের মিল। সেই সুর আকাশের আলোয় মূর্তি লাভ করিয়া সমস্ত বিশ্ব যে পরিপ্লাবিত করিয়াছে। তাই প্রভাতের দিকে চাহিয়া—

আকাশে ঐ অরুণ রাগে
মধুর-তান করুণ লাগে
বাতাস মাতে আলো ছায়ার
মায়ার খেলাতে।

সুরের মিলের মধ্যে আলো-ছায়ার একটি মায়া রহিয়াছে ; ভালোর সঙ্গে মন্দ, সূক্ষ্মের সঙ্গে স্থূল, মহতের সঙ্গে তুচ্ছ এখানে একটা সমন্বয় সাধন করিয়াছে। এই সমন্বয়ের রূপটিকে বলি মায়া ; দুই বিপরীত যেখানে এক

হইয়াছে তাহাকে বলি মায়া। মায়া না হইলে দুই বিপরীত পাশাপাশি থাকিবে কেমন করিয়া, আর দুই বিপরীতকে পাশাপাশি না রাখিতে পারিলে সুরের মিল হইবে কেমন করিয়া, প্রেম আসিবে কেমন করিয়া ?

প্রেমের এই মায়ায় কবির চিত্ত আবিষ্ট ; এখন 'স্বপন সাথে জড়িয়ে জাগা' এক তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা—

নীলিমা এই নিলীন হল
আমার চেতনায়
সোনার আভা জড়িয়ে গেল
মনের কামনায়।
লোকান্তরের ওপার হতে
কে উদাসী বায়ুর স্রোতে
ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ওই
মেঘের ভেলাতে।

গীতিমাল্যে এইরূপে কবি গানে গানে প্রেমের আনন্দটি স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন, প্রেমকে অন্তরঙ্গ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। এ অনুভূতি এই স্পর্শ আর কিছুই নয়, প্রেমের সাধনায় অন্তরের গহন পথের কুঞ্জবনে পথ চলা। এই পথ চলাতে গীতিমাল্যের বাণীভঙ্গি অভিনব হইয়া উঠিয়াছে।

স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি
মনের মধ্যে অনেক দূরে।
ঘোরা ফেরা যায় যে ঘুরে !

এখন নিচলজলে নীল নিকষে সন্ধ্যাতারার আলো আসিয়া পড়িয়াছে ; পারাপারের সময় উত্তীর্ণপ্রায়, কিন্তু খেয়া তরীর দেখা নাই। এখন তাই সন্ধ্যাদীপের আলোয় কবির অশ্রুর প্রতীক্ষা।

এই খেয়ার সুরে গীতাঞ্জলি হইতে গীতিমাল্যের একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষিত হয়। ভাষার দিক দিয়াও গীতিমাল্যের গানগুলি আরও মার্মিক হইয়া উঠিয়াছে। নৈবেদ্যের পর যেমন খেয়া কাব্য, গীতাঞ্জলির পর তেমনিই গীতিমাল্য। 'গীতিমাল্যে'র মধ্যে পরপারের এমনই একটি আলোকস্পন্দন রহিয়াছে যাহাকে অভিধানে ধরা যায় না, যাহা ব্যাখ্যার বিষয় নহে, যাহা অধিকারী মনেরই আস্বাদনের বিষয়।

গীতিমাল্যে সুরের খেয়া পার হইয়া গীতালিতে কবি বন্ধুর দেখা পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ আসিয়া থামিয়াছে, কবির সকল ক্রন্দন, সকল জাগরণ সার্থক হইয়াছে।

গীতালিতে তাই প্রাপ্তির আনন্দ; হৃদয়ের পুব গগনে আলোক রেখা দেখা গিয়াছে; ভয় ঘুচিয়াছে, জয় আসিয়াছে, হৃদয়ের সাগরতীরে কে ওই একাকী দাঁড়াইয়া আছে—কবি আপনার মধ্যে আপনি ভরপুর হইয়া উঠিয়াছেন।

আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি
সেথায় চরণ পড়ে,
তোমার সেথায় চরণ পড়ে।
তাই তো আমার সকল পরাণ
কাঁপছে ব্যাথার ভরে গো
কাঁপছে থরে থরে!

এখন অন্ধকারের দরজা খুলিয়া জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব; নব প্রভাতের তীরে কবি উপনীত হইয়াছেন, কবির আর দেরী হইবে না।

গীতালি কাব্যে তাই একটি গভীর প্রশান্তির রূপ দেখি। গীতাঞ্জলিতে সংসারের যে ক্রন্দন মিশিয়াছিল, গীতিমাল্যে খেয়ার মধ্যে যে সন্ধান ছিল এখন সেই ক্রন্দন ও সন্ধানের অন্তে কবি সব কিছুকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এখন কবি বুঝিয়াছেন—

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।

এতদিন কবি পাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, এখন বুঝিলেন হওয়াই শেষ কথা। বলিলেন, প্রেমে আমরা কিছু পাই না, প্রেমে আমরা কিছু হই। যখন কেবলই পাওয়ার কথা বলি, তখন প্রাপ্তির সঙ্গে নিরন্তর দূরত্ব রচিত হইতে থাকে। সংসারে সন্ধান করিতে যাই, মন শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসে, সংসারকে বাদ দিতে চাই, মন অবলম্বন হীন হইয়া শূন্যতায় হাঁপাইয়া উঠে। অথচ জীবন-স্রোতে ঢেউয়ের পরে ওই যে আলোটি দুলিয়া দুলিয়া ভাসিতেছে, সেই আলোর কমলটিকে যে তুলিয়া লইতে সাধ যায়। কিন্তু

সে তো বস্তু নয়, বিশেষ নয়; সে যে আনন্দ, সে যে প্রেম। তাহাকে যে হাতে করিয়া পাইবার উপায় নাই।

তাহা হইলে উপায় কি?—আমাকে প্রেম হইতে হইবে। 'শান্তি-নিকেতন গ্রন্থে 'হওয়া' নামক নিবন্ধে কবি বলিতেছেন—"পাওয়া মানেই আংশিক পাওয়া।....ও জায়গায় আমাদের কেবল হওয়া, পাওয়া নয়। তাঁকে আমরা পাব না, তাঁর মধ্যে আমরা হব। আমার সমস্ত শরীর মন হৃদয় নিয়ে কেবলই হয়ে উঠতে থাকব। ছাড়তে ছাড়তে বাড়তে বাড়তে মরতে মরতে বাঁচতে বাঁচতে আমি কেবলই হব। পাওয়াটা কেবল এক অংশে পাওয়া, হওয়াটা যে একেবারে সমগ্রভাবে হওয়া সে তো লাভ নয়, সে বিকাশ।"

এই হওয়ার জন্য হে আমার প্রাণের ঠাকুর, তুমিই তো আমাকে বিষম ব্যথায় বার বার সুরে বাঁধিয়া লইতেছে, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াইয়া দহনদানে এ জীবনকে পুণ্য করিয়া তুলিতেছ। এই আলোর সঙ্গীতে আমার মধ্য হইতেও যে আলো বিচ্ছুরিত হইয়াছে। আমিও কি আলোক দেহ লাভ করিয়াছি! আমিও কি প্রেম হইয়া উঠিয়াছি! যখন পাওয়ার কথা বলিতেছিলাম, তখন বিশ্বের সঙ্গে দূরত্ব রচিত হইয়াছিল; এখন হওয়ার আনন্দে দেখিলাম, পাওয়ার কথা তো উঠে না, উভয়ে যে একই। এখন তাই আনন্দময় ভুবনে আনন্দ হইয়া বিচরণ করি। এখন আপনাকে বাহিরে দেখিয়াছি, বাহিরকে দেখিয়াছি আপনার মধ্যে এবং বাহির ও অন্তরকে জুড়িয়া যে হৃদয় দেবতা প্রেমের আসনটি পাতিয়াছেন, সেই আঁধারের সাথির করুণ হাতটিতে হাতের রাখিটি বাঁধিয়া দিয়াছি। এইবার দুঃখে সুখে এই কথাটি স্মরণ করিয়া জীবনের পথে নামিলাম যে—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের' পরে।

---



"রাজা ও রঞ্জনের মধ্যে সম্বন্ধ কি? রাজাই কি একাংশে নন্দিনীর জীবনের প্রথম অধ্যায়ে রঞ্জনরূপে পরিচিত ছিল? তাই বুঝি নন্দিনী রাজার মধ্য হইতে তাহার প্রাণের রঞ্জনকে উদ্ধার করিতে চায়। এরূপ ব্যাখ্যা অপ্রত্যাশিত, অপূর্ব এবং অত্যন্ত ব্যঞ্জনাপূর্ণ। গ্রন্থখানি বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সমাদরের যোগ্য ইহা পুনর্বার বলিতে চাই।"—দেশ

"লেখক রক্তকরবীর মূল সুরটি ধরিতে পারিয়াছেন। রচনা দার্শনিকতাপূর্ণ কিন্তু তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশে মূল কথাটি চাপা পড়ে নাই। লেখকের মত এই: 'রক্তকরবী' নাটককে বুঝিতে হইলে আগে তাহার মধ্য হইতে মানুষের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনের কাহিনীটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। গ্রন্থকার চিন্তাশীল এবং রসগ্রাহী।"—প্রবাসী